প্রকাশনার ৮১ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২২ ❖ ৬ - ১২ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

জুন মাস : যিশু হৃদয়ের মাস

সাধু যোসেফ বর্ষে করণীয় কিছু দিক

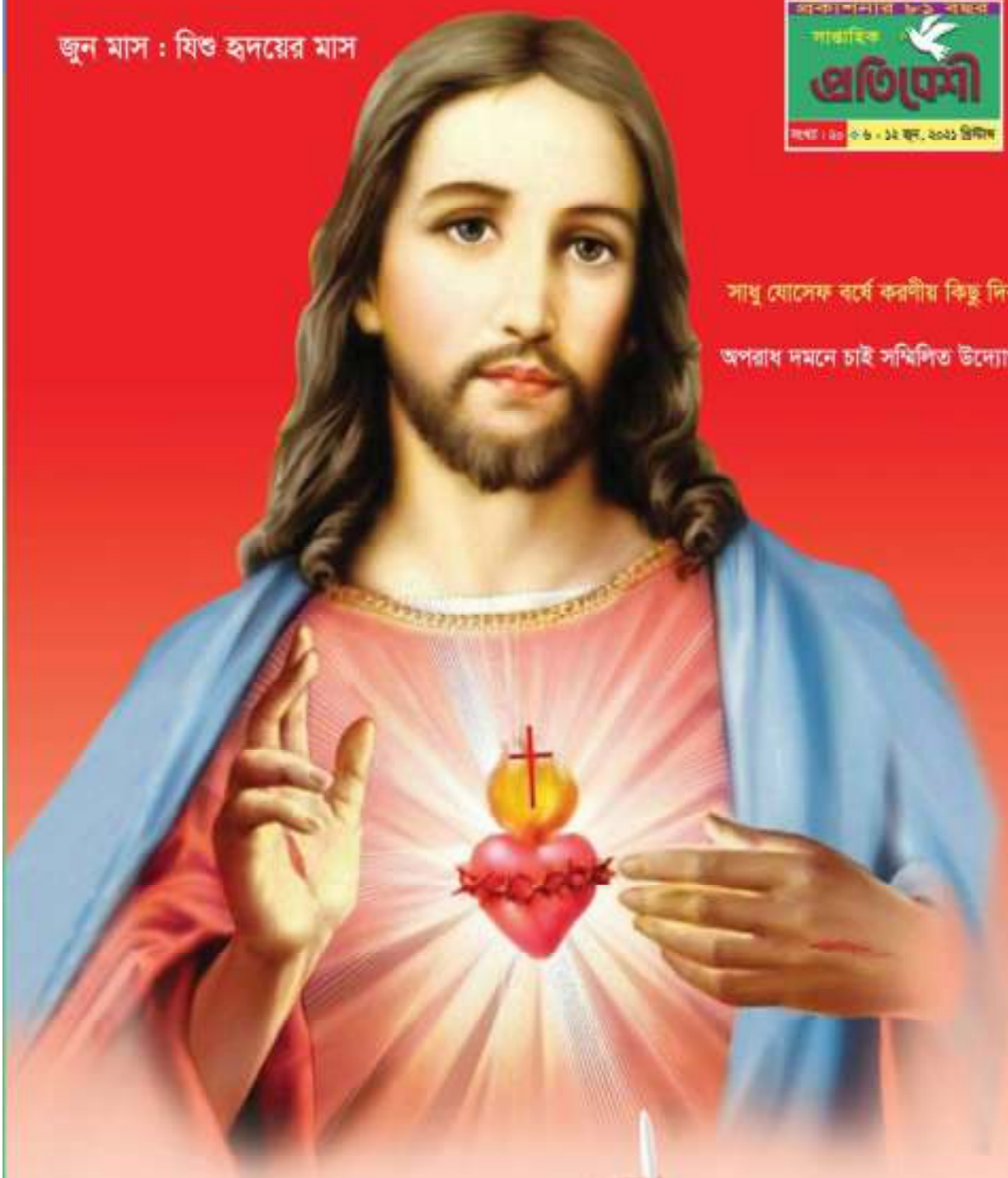

অপরাধ দমনে চাই সম্মিলিত উদ্যোগ

'যিশুর পবিত্র হৃদয়' সর্বজনীন ও সীমাহীন ভালোবাসার উৎস

যিশু আসেন আমাদের জীবন রাঙিয়ে দিতে

যিশুর দেহ রক্তে অনন্ত জীবন

"তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম"

শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রয়াত জন ডি'কস্তা

জন্ম : ২ মে, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৪ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
মহাখালী, ঢাকা

প্রিয় বাবা,

দেখতে দেখতে একটি বছর চলে গেল। ফিরে এলো সেই স্মৃতিময়, শোকাহত স্মরণীয় দিনটি যেদিন তুমি ইহজগতের সমস্ত স্নেহ ও মায়া-মমতার বন্ধন ছিন্ন করে এই সুন্দর পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছ।

তোমার সেই স্মৃতিময় দিনগুলো আজও আমাদের কাঁদায়। স্বর্গধাম হতে আমাদেরকে আশীর্বাদ করো বাবা। পরম করুণাময় ঈশ্বর তোমাকে অনন্ত সুখ দান করুন। এ প্রার্থনায় –

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে —

বড় ছেলে- ছেলে বউ : টিটু ও জুই ডি'কস্তা
নাতী : দুর্লভ ও দর্পণ ডি'কস্তা
মহাখালী, ঢাকা

ছোট ছেলে - ছেলে বউ : লিটু ও লীনা ডি'কস্তা
নাতনী : গ্রেস ও এনজেল ডি'কস্তা
টরন্টো, কানাডা

সহধর্মিনী : আন্না ডি'কস্তা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ২০
০৬ - ১২ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
২৩ - ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

প্রকৃত ভালোবাসায় সবই সম্ভব

ভালোবাসা থেকেই মঙ্গলদায়ী সবকিছু উৎসারিত হয়। জগৎ সৃষ্টি ও মানব মুক্তির ইতিহাস আসলে মানুষের প্রতি সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের ভালোবাসারই ইতিহাস। ঈশ্বর কেন জগৎ ও মানুষ সৃষ্টি করলেন, তার উত্তরে মাণ্ডলীক শিক্ষায় বলা হয়, ঈশ্বরের গৌরব বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু মধ্যযুগের বিখ্যাত দার্শনিক ও ঐশতত্ত্ববিদ সাধু টমাস আকুইনাস বলেন, ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা ও ভালোবাসার মধ্যেই নিহিত রয়েছে জগৎ সৃষ্টির কারণ। মঙ্গলময়তা ও ভালোবাসা স্বতসিদ্ধভাবে বৃদ্ধি পায়। ভালেবাসার যাদের অভিজ্ঞতা আছে তারা জানে ভালোবাসা কখনোই নিজের মধ্যে বন্দী থাকে না। তা ছড়িয়ে যায় ও ছাড়িয়ে যায়। তাই বলা যায় ভলোবাসার কারণেই ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ও যত্ন নিচ্ছেন। ভালোবাসাই ঈশ্বরের পরিচয়। মানবজাতির জন্য সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের ভালোবাসা মূর্ত করেছেন পবিত্র ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তি যিশু তাঁর মানবদেহ ধারণের মধ্যদিয়ে। যিশু তাঁর নিস্বার্থ ভালোবাসা দেখিয়েছেন তাঁর জীবনযুদ্ধে গরীব-দুঃখী, অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া, রোগি-অসুস্থ এবং পাপী-তাপীদের পাশে থেকে। পাপীদের মুক্তির জন্য ক্রুশে প্রাণোৎসর্গ করে এবং শত্রুদের ক্ষমা করে যিশু জগতের ভালোবাসাকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। মানুষকে ভালোবেসেই ঈশ্বর সৃষ্টি থেকে মুক্তি সবই সম্ভব করেছেন।

মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা দেখে নিজেদের ভালোবাসা শুদ্ধ করার সুযোগ নিয়ে আসে যিশু হৃদয়ের মাস জুন মাস। মাণ্ডলিক ঐতিহ্য অনুযায়ী জুন মাসে খ্রিস্টানগণ যিশু হৃদয়ের প্রতি বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকে। যিশুর হৃদয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জাগ্রত করতে জুন মাসেই যিশুর হৃদয়ের মহাপর্ব পালন করা হয়। এ বছর তা পালিত হবে ১১ জুন। হৃদয় ভালবাসার স্থান। মানুষকে ভালবাসার উৎস যিশুর হৃদয় ভালবাসাতে পূর্ণ। যে ভালবাসাতে রয়েছে ক্ষমা, দয়া, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা-সম্মান, একতা-মিলন, সহযোগিতা-সহভাগিতা। যিশুর হৃদয়ের সেই ভালোবাসাতেই স্নাত হবার আহ্বান রাখা হয় প্রত্যেকজন খ্রিস্টবিশ্বাসীকে। কিন্তু বাস্তবতায় দেখি, আমাদের হৃদয় স্বার্থপরতায় পূর্ণ আমাদের ভালবাসা লোক দেখানো। হিংসা-দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, অলসতা ও অসততা আমাদের হৃদয়ে বিশেষ স্থানে রয়েছে। ফলশ্রুতিতে আমাদের হৃদয় যিশুর হৃদয়ের মত হয়ে ওঠতে পারছে না। জুন মাসে আমাদের সংকল্প হোক আমরা আমাদের হৃদয়কে যিশুর হৃদয়ের মত করে তুলব। তাঁর অফুরন্ত ভালোবাসায় আমরাও প্রতিবেশিকে ভালবাসব। ভালোবাসার সংকীর্ণতা বাদ দিয়ে যিশুর পুণ্য হৃদয়ের সংস্পর্শে আমাদের হৃদয়কে যিশুর মত ভালোবাসায় পূর্ণ ও মহৎ করে তুলব। যিশুর পবিত্র হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে অনেক সাধু-সাধ্বী পূণ্য পথে চলার শক্তি পেয়েছে। আমরাও যেন যিশুর হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে পুণ্য পবিত্র হতে পারি।

মানুষকে ভালবেসেই ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের দ্বিতীয় ব্যক্তি মানুষ হলেন। মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধারকল্পে নিজের জীবন দান করলেন। নিজের দেহ ও রক্ত দান করে মানুষকে আত্মিক ও মানসিকভাবে পরিপুষ্ট করে যাচ্ছেন। ভালোবাসার কারণেই যিশু নিজ দেহ-রক্ত দান করার মাধ্যমে মানুষের সাথে সংযুক্ত থাকতে চাইলেন। যিশুর এই অকৃপণ ভালোবাসার দানে আমরা কিভাবে সাড়া দেই, তা তলিয়ে দেখতে হবে। ৬ জুন যিশুর দেহ-রক্তের মহাপর্ব। যিশুর দেহ-রক্তের প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ পায় আমরা কিভাবে তা গ্রহণ করি ও তা দান করি তার ওপর। প্রকৃত ও যথোপযুক্ত ভালোবাসা নিয়েই যিশুর দেহ বা খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবতায় দেখা যায়, অনেকেই অপ্রস্তুত ও পাপের অবস্থায় যিশুর দেহ গ্রহণ করছে। আবার অনেকে লোক দেখানোর জন্য তা করে যিশুর ভালোবাসা ও ত্যাগস্বীকারকে অপমান করছে। যিশুর দেহ-রক্তের প্রতি লোক দেখানো কিংবা উদাসীনতার মনোভাব পরিত্যাগ করা একান্তই আবশ্যক। প্রকৃত ভালোবাসা ও খাঁটি মনোভাব নিয়ে যিশুর দেহ রক্ত বা খ্রিস্টপ্রসাদ নিয়মিতভাবে গ্রহণ করলে আমাদের খ্রিস্টীয় জীবন-যাপন অনেকটা পরিপুষ্টতা লাভ করবে। মানবিক দুর্বলতার কারণে আমরা পাপী অবস্থায় থাকলে খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ না করে যতো শিঘ্র সম্ভব পুনর্মিলন সাক্রামেন্ত গ্রহণ করে নিজেকে প্রস্তুত করবো খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণের জন্য। খ্রিস্টপ্রসাদ বা যিশুর দেহ-রক্ত গ্রহণের ফলে আমরা যেনো উদ্বুদ্ধ হই নিজেদের দৈহিক শক্তি ও নৈতিকতা দিয়ে যেকোন অবস্থায় অন্যদের সেবা করতে। অন্তরে যদি প্রকৃত ভালোবাসা থাকে তাহলে সকল প্রতিকূলতা জয় করতেও সক্ষম হবো আমরা। প্রকৃত ভালোবাসার মানুষ হয়ে ওঠতে প্রতিদিন প্রার্থনা করি - হে যিশু হৃদয়, আমার হৃদয় তোমার হৃদয়ের সদৃশ করো। †

তাঁদের ভোজ চলছে, এমন সময়ে তিনি রুটি গ্রহণ করে নিয়ে 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করে তা ছিঁড়ে তাঁদের দিলেন এবং বললেন, 'গ্রহণ করে নাও, এ আমার দেহ।' *(মার্ক ১৪:২২)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

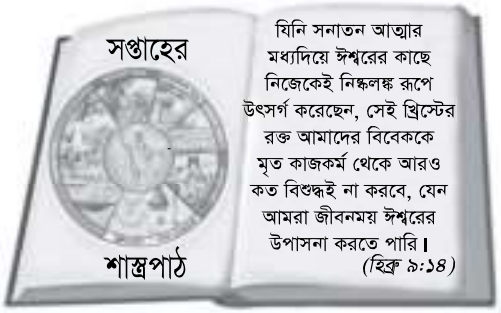

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৬ - ১২ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

৬ জুন রবিবার

খ্রিস্টের পুণ্য দেহ-রক্তের মহাপর্ব

যাত্রা ২৪: ৩-৮, সাম ১১৬: ১২-১৩, ১৫-১৮, হিব্রু ৯: ১১-১৫, মার্ক ১৪: ১২-১৬, ২২-২৬

৭ জুন সোমবার

২ করি ১: ১-৭, সাম ৩৪: ১-৮, মথি ৫: ১-১২

৮ জুন মঙ্গলবার

২ করি ১: ১৮-২২, সাম ১১৯: ১২৯-১৩৩, ১৩৫, মথি ৫: ১৩-১৬

৯ জুন বুধবার

২ করি ৩: ৪-১১, সাম ৯৯: ৫-৯, মথি : ১৭-১৯

১০ জুন বৃহস্পতিবার

২ করি ৩: ১৫-- ৪: ১-৬, সাম ৮৫: ৮কখ, ৯-১৩, মথি ৫: ২০-২৬

১১ জুন শুক্রবার

যিশুর পবিত্র হৃদয়-এর মহাপর্ব

হোসেয়া ১১: ১, ৩-৪, ৮গ-৯, সাম ১২: ২-৩, ৪, ৫-৬ এফেসীয় ৩: ৮-১২, ১৪-১৯ যোহন ১৯: ৩১-৩৭

১২জুন শনিবার

কুমারী মারীয়ার নির্মল হৃদয়-এর স্মরণ দিবস

ইসাইয়া ৬১: ৯-১১, সাম সামু ২: ১, ৪-৫, ৬-৭, ৮কখগঘ, লুক ২: ৪১-৫১

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৬ জুন রবিবার

+ ১৯২৪ সিস্টার এম এলজিয়ার আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৬ ফাদার যোসেফ জিত্তি এসএজ (খুলনা)

৮জুন মঙ্গলবার

+ ১৮৯৪ বিশপ আগষ্টিন লুয়াজ সিএসসি
+ ১৯৭১ সিস্টার ইম্মানুয়েল এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)

৯ জুন বুধবার

+ ১৯৯৬ বিশপ যোয়াকিম রোজারিও সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১০ জুন বৃহস্পতিবার

+ ১৯৯৬ সিস্টার জুলিয়ানা বল্লিও ওএসএল
+ ২০০৩ সিস্টার জেমস ভলয়াথো এসসি (ঢাকা)

যাত্রা হোক মানবতার

মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করলেই মানুষ হওয়া যায় না, মানুষ হওয়া সাধনা, প্রায়শ্চিত্ত ও আত্মসংযমের ব্যাপার। জ্ঞান লাভ করে নিজের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলার ব্যাপার। পরস্পরের প্রতি অন্তরের ভালোবাসা, করুণা, সহানুভূতি, সেবার মনোভাব থাকতে হবে প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসতে হবে। মানুষ ভালবাসার প্রতীক।

আমরা মানুষ, আমাদের আশেপাশে বসবাস করছে মানুষ, চলাফেরা করছে, কথা বলছে মানুষ, আমরা দেখছি মানুষ। তারপরও প্রশ্ন উঠছে মানুষ আসলে কী? পবিত্র বাইবেলের ভাষায় ঈশ্বর বলেন নাই, মানুষ হোক, আর অমনিই মানুষ হয় নাই। ঈশ্বর তাঁর পরিপূর্ণ ভালবাসা নিয়ে ধুলিকণা দিয়ে নিজের সাদৃশ্যে মানুষকে নরনারী হিসাবে সৃষ্টি করলেন, মানুষকে দান করলেন অমর আত্মা, দিলেন পূর্ণ স্বাধীনতা, বংশ বিস্তার করে, ঈশ্বরের প্রতি আনুগতশীল থেকে, ঐশ্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমস্ত জগতের উপর আধিপত্য লাভের ক্ষমতা। কিন্তু স্বাধীনুার অপব্যবহার ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করে পাপে জড়িয়ে পড়ল। মানুষ ঈশ্বরকে সম্মান করতে ব্যর্থ হল। মানুষ সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের অবাধ্য হলো।

দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন সংবাদপত্রের দিকে চোখ রাখলেই দেখতে পাই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, মিথ্যা মামলা, জমি দখল, লোভ, লালসা, অপহরণ, মুক্তিপণ দাবী, নানাভাবে মানুষ পাপে আসক্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং মানুষ পাপী।

মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। মানুষে মানুষে কোনো উঁচু-নীচু নেই। সব মানুষ সমান। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় গেয়েছেন, "কালো আর ধলো বাহিরে কেবল, ভিতরে সবারই সমান রাঙ্গা।" কবির ভাষায়, আমাদের অবস্থান হওয়া উচিত সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে, কিন্তু বাস্তবে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা লেগেই আছে। তাই বলা চলে, মানুষ সাম্প্রদায়িকতায় বিভক্ত।

এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন করে, গ্রাম ছাড়া করে, ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়, জমি দখল করে নেয়, ভয় ভীতি দেখিয়ে অশুভ প্রভাববলয় বিস্তার করে ভয়ের রাজত্ব তৈরী করে। মানুষ সাম্প্রদায়িক। এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, এক জাতি আর এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, ব্যবহার করে সর্বপ্রকার মারাত্মক অস্ত্র, যেমন ট্যাঙ্ক, কামান, মিসাইল, মেসিন গান, বোমারু বিমান, বোমা, বিভিন্ন ধরনের দূর পালার ক্ষেপনাস্ত্র। এসবের ব্যাপক তৈরী এবং ব্যবহার আজও চলছে এবং চলবে। আরও চলছে যুদ্ধের মহড়া, যুদ্ধের প্রস্তুতি, সীমান্ত দখল। যুদ্ধের পরিকল্পনা করে মানুষ, যুদ্ধ করে মানুষ, যুদ্ধের শিকার হয় মানুষ এবং সম্পদ। কোটি কোটি অর্থ ব্যয় করে মারাত্মক অস্ত্র তৈরী হয় মানুষ হত্যা করার জন্য। অথচ এই অর্থ দিয়ে সুন্দর একটি বিশ্ব গড়ে তোলা যায়। অপ্রিয় হলেও সত্য ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য মানুষের অস্ত্র প্রতিযোতিতা এখনও চলছে এবং চলবে। যদি এমনটি নিয়ম থাকত যে যত পরিমান অর্থের অস্ত্র নির্মাণ করবে, সেই সমপরিমান অর্থ দরিদ্র দেশের জন্য দান করবে।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যত বছরই হোক না কেন, অনন্ত কালের তুলনায় অতি অল্প সময় মাত্র। আমরা এই পৃথিবীতে ক্ষণিকের যাত্রী, আমাদের এই যাত্রাপথ কতটুকু সুন্দর ও সার্থক? শৈশব, কৈশোর ও যৌবন পেরিয়ে মানুষের শেষ জীবন দাম্পত্য জীবনে, কে কতটুকু সফলতা অর্জন করতে পেরেছে বা সুখী হতে পেরেছে? সংসার ভাঙছে, এখনও ভাঙ্গছে, কেউ সন্তানদের নিয়ে, কেউ সন্তানদের ফেলে রেখে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, ভিন্ন পুরুষের সাথে অনৈতিকভাবে সংসার করছে। আবার স্বামীও একই রকম আচরণ করে থাকে। এটা ক্ষণিকের আনন্দ, অন্ধ আনন্দ, ভালকে জেনেও না জানার ভান করে ওরা অন্ধ পথের যাত্রী, একদিন অন্ধকারেই বিলীন হয়ে যাবে। তখন কোথায় থাকবে তাদের অবস্থান! ভোগের জন্য ত্যাগের জন্যই নয় হোক মানুষের জীবন।

বেঞ্জামিন গমেজ

আমেরিকা

যিশুর দেহ রক্তে অনন্ত জীবন

ফাদার নরেন জে বৈদ্য

ভূমিকা : "যিশু হাতে একখানা রুটি নিলেন; তারপর ঈশ্বরকে স্তুতি-ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি সেই রুটিখানি ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করলেন; তারপর তা শিষ্যদের দিয়ে বললেন : নাও, খাও, এ আমার দেহ" *(মথি ২৬:২৬; দ্র: ১ করি ১১:২৪)*। যখন আমরা প্রভুর বেদীর কাছে উপবিষ্ট হই তখন আমি কি নিরাময়, ক্ষমা, সান্ত্বনা, আত্মার বিশ্রাম...প্রত্যাশা করি? যিশুর দেহ ও রক্তে রয়েছে অনন্ত জীবন। একমাত্র যিশুই অনন্ত শাশ্বত জীবনের ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করতে পারেন। উপাসনা বিষয়ক সংবিধান, ১০ নং ধারায় বলা হয়েছে : " খ্রিস্টপ্রসাদ থেকে ঝর্ণাধারার মত আমাদের উপর কৃপা বর্ষণ করা হয়।" 'খ্রিস্টপ্রসাদ থেকেই খ্রিস্টমন্ডলী জীবন পায়', এই সত্যটি আমাদের জীবনে কতটুকু সত্য?

মণ্ডলীর আইন সংহিতায় খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কার: Canon Law মণ্ডলীর আইনবিধি ৮৯৮ নং ধারায় উল্লেখ আছে : পবিত্রতম খ্রিস্টপ্রসাদ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ট সংস্কার যার মধ্যে স্বয়ং খ্রিস্টপ্রভু উপস্থিত থাকেন, উৎসর্গীকৃত হন ও গৃহীত হন এবং যার মাধ্যমে মণ্ডলী জীবন ধারণ করে ও বৃদ্ধিলাভ করে। খ্রিস্টপ্রসাদীয় বলিদান, তথা খ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের স্মরণোৎসব যার মধ্য দিয়ে যুগ যুগ ধরে ক্রুশীয় বলিদান উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে, সেই খ্রিস্টযাগ সকল খ্রিস্টিয় উপাসনা ও খ্রিস্টিয় জীবনের শিখর ও উৎস।. . . মণ্ডলীর অন্যান্য সংস্কার এবং সকল প্রৈরিতিক কাজ খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং এর দিকে পরিচালিত"। মণ্ডলীর আইনবিধি ৮৯৮ নং ধারায় বলা হয়েছে : "ভক্তগণ পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কারের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করবে। পুণতম যজ্ঞবলী উৎসর্গে অংশ নিবে, ভক্তিসহকারে ঘন ঘন এ সংস্কার গ্রহণ করবে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা সহকারে পূজা করবে।"

যজ্ঞীয় ভোজসভায় খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণের ফল কি? "যে আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে সে শাশ্বত জীবন পেয়েই গেছে " *(যোহন ৬:৫৪)*। খ্রিস্টযাগে পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদে প্রভুর দেহ ভোজ বা খাদ্যরূপে উপস্থাপন করার তাৎপর্য হলো : "যে আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে সে আমার মধ্যে বাস করে আর আমি তার মধ্যে বাস করি" *(যোহন ৬:৫৬)*। খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণের ফলে আমাদের পরস্পরের মধ্যে মিলন ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হয়। " যে পাত্রটি নিয়ে আমরা আশীবাণী উচ্চারণ করি, তা থেকে পান করে আমরা কি খ্রিস্টের রক্তের সহভাগী হয়ে উঠি না ? আর সেই যে রুটি, যা আমরা ছিঁড়ে টুকরো করি, তাই গ্রহণ করে আমরা কি খ্রিস্টের সহভাগী হয়ে উঠি না ? যেহেতু সেই রুটি এক, তাই আমরা অনেক হয়েও এক দেহ কারণ আমরা সকলেই সেই একই রুটির অংশভাগী" *(১ম করিন্থীয় ১০: ১৬-১৭)*।

খ্রিস্টযাগ প্রেরণকর্মের শক্তির উৎস।

খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করা ও খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করার উদ্দেশ্য হলো দেহ ও রক্ত গ্রহণকারীরা যেন একাত্ম হয়ে ওঠে। খ্রিস্টযাগে পুরোহিত পবিত্র আত্মার কাছে এই মিনতি নিবেদন করে বলেন: অনুনয় করি, খ্রিস্টের শরীর ও রক্তের সহভাগী হয়ে আমরা যেন পবিত্র আত্মার দ্বারা একাত্ম হয়ে উঠি। আধ্যাত্মিক ক্ষুধা ও পিপাসা একমাত্র ঈশ্বরই নিবৃত্ত করতে পারেন। প্রভু যিশুকে পেলে আমাদের জীবন অনাবিল আনন্দে পূর্ণ হয়। জগতের ধন সম্পদ, মান সম্মান জ্ঞান গরিমার ক্ষুধা পিপাসা মানুষকে অনেক অধপতনের দিকে নিয়ে যায়।

খ্রিস্টের রক্ত পরিত্রাণের প্রতীক

ত্রাণকর্তা যিশুর আদি খ্রিস্টান প্রতীক ছিল পেলিক্যান পাখী। মধ্যযুগে এ প্রতীকটির ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এ পাখী নিজের রক্ত দিয়ে এর শাবকদের খাওয়ায় বলে একটি ধারণা প্রচলিত ছিল; তাই পাখীটি আত্মত্যাগের প্রতীক হয়ে উঠে। কালভেরী পর্বতে এবং প্রতিদিনের খ্রিস্টযাগে মানব জাতির পরিত্রাণকল্পে খ্রিস্ট তাঁর রক্তদান করেন বলে পাখীটি আত্মত্যাগী খ্রিস্টেরও প্রতীক। সাধু টমাস আকুইনাস্ Adoro:e নামক পবিত্র আরাধ্য সংস্কারের উদ্দেশ্যে লিখিত গানে যিশু খ্রিস্টকে "আমাদের পেলিক্যান" পাখী বলে সম্বোধন করেছেন: "হে প্রেমময় পেলিক্যান ! হে প্রভু যিশু! আমি পাপী। তোমার রক্ত দ্বারা আমাদের পরিশুদ্ধ কর। এ রক্তের একটি ফোঁটা পাপীদের জন্য পতিত হলে তা সমগ্র বিশ্বকে তার পাপিষ্ঠতা থেকে মুক্ত করতে সক্ষম।

সর্বাপেক্ষা সুখের দিন : প্রথম কম্যুনিয়ন গ্রহণের দিন : খ্রিস্টপ্রসাদ সাক্রামেন্তে যিশু খ্রিস্টকে গ্রহণ করার নাম পবিত্র কম্যুনিয়ন। কম্যুনিয়ন শব্দের অর্থ মিলন। সুতরাং পবিত্র কম্যুনিয়নে আমরা প্রভুর সাথে মিলিত হয়ে থাকি। একদিন একজন সেনাপতি নেপোলিয়ন বোনাপার্টিকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, "আপনার জীবনে সর্বাপেক্ষা সুখের দিন কোনটি ? সেনাপতি ভেবেছিলেন যে, সম্রাট হয়তো কোন একটি যুদ্ধ জয়ের দিন উল্লেখ করবেন। কিন্তু নেপোলিয়ন স্মিতহাস্যে উত্তর দিলেন," সেই দিন যেদিন আমি প্রথম কম্যুনিয়ন পেয়েছিলাম সেই দিনই আমার জীবনে সর্বাপেক্ষা সুখের দিন ছিল; কারণ সেইদিনে আমি আমার ঈশ্বরের সহিত প্রথম মিলনের রাখি বেধেঁছিলাম"। এই রূপ উত্তরে সেনাপতি একেবারে বিস্মিত হয়ে গেলেন।

উপসংহার : "আমাদের নিস্তার বলি সেই খ্রিস্ট বলিকৃত হয়েছেন" *(১ করি ৫:৭)* । রুটি - দ্রাক্ষারসের আকারে খ্রিস্টের দেহ ও রক্ত আমাদের খ্রিস্টের যাতনা ও মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যজ্ঞানুষ্ঠানের দিকে প্রশ্ন করতে হয় - যজ্ঞানুষ্ঠানে আমার চেতনা ও উপলব্ধি কতটুকু ? সেখানে আমি কি খ্রিস্টকে ক্রুশে মৃত্যু যন্ত্রণায় দেখতে পাই ? যাতনা ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে খ্রিস্টকে চুর্ণ- বিচুর্ণ হতে হয়েছিল। ঠিক তেমনি প্রভুর ভোজে রুটি ও দ্রাক্ষারসের আকারে খ্রিস্টকে গ্রহণ করে আমরা যদি খ্রিস্টে রূপান্তরিত হতে চাই, তবে আমাদের পুরাতন সত্তাকে, পাপ স্বভাবকে চুর্ণ -বিচূর্ণ করতে হবে। যিশুর দেহ রক্তের পার্বণ আমাদেরকে অনুধ্যান করতে জোর তাগিদ দেয়। আমি কিসের জন্য ক্ষুধার্ত ? For what do I hunger and thirsty? আমি কি জীবন-রুটির জন্য ক্ষুধার্ত ? যিশু কেন বলেছেন- আমি জীবনদায়ক খাদ্য ? Why did Jesus call himself the bread of life? Do I value the importance of attending Mass? খ্রিস্টযাগ যোগদান করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি কি তা উপলব্ধি করি ? ভাই মানুষের সেবার তরে, আমি কি নিজেকে রিক্ত করে, আত্মত্যাগে জীবন বিসর্জন দেই ? খ্রিস্টপ্রসাদ কিভাবে আমার জীবন রুপান্তরিত করতে পারে ?

How the Eucharist can transform your life? Let us prepare ourselves for receiving Holy Communion by praying: Dear Lord, may I receive you in this Communion With open arms, And a loving, contrite heart,
So that I may be filled with Your grace, For my good and Your glory!

Amen.

যিশু আসেন আমাদের জীবন রাঙ্গিয়ে দিতে

ফাদার জনি হিউবার্ট গমেজ

সৃষ্টির এক চিরন্তন আবেদন ও আনন্দ রয়েছে। ঈশ্বর আনন্দ হতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। তিনি চেয়েছেন চিরস্থায়ী হোক এই আনন্দ। তাই তো তিনি আপন আনন্দ মানুষের অন্তরে বুনে দিয়েছেন যেন চিরকাল মানব-সন্তান সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মেতে উঠতে পারে। এভাবে ঈশ্বরের স্বরূপ মানুষের জীবনে প্রকাশিত ও বিকশিত হয়েছে যেন সে ঈশ্বরের জীবনে প্রস্ফুটিত হতে পারে। তাই মনুষ্য জাতি হয়ে উঠেছে ঈশ্বরের অনন্য ও শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। ঈশ্বর সর্বতোভাবেই চেয়েছেন মানুষ যেন চিরকাল সুখে ও শান্তিতে বসবাস করে এবং সৃষ্টির রহস্যধ্যানে নিজেকে অনবরত আনন্দিত রাখে। ঈশ্বর নর ও নারীকে সহ-সৃষ্টিকারী করে গড়ে তুলেছেন যেন সৃষ্টির সৌন্দর্য কালচক্রে অবিরত বর্ধিত ও পূর্ণ হয়। তিনি মানুষকে সৃষ্টির ক্রমবিকাশ বজায় রাখার অধিকার ও ক্ষমতা দিয়ে জগতকে রক্ষণাবেক্ষণ করার মহৎ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। নরকুল স্বয়ং ঈশ্বর প্রদত্ত সৃজনশীলতা ও অধিকার প্রাত্যহিক যাপিত জীবনে অনুশীলন করে চিরআনন্দ সাধনায় নিত্য নতুন সৃষ্টির অভিজ্ঞতা করে চলছে। তবে ঈশ্বরের প্রীতিভাজন মানুষ যে সর্বদা নিজের মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে পেরেছে তা কিন্তু নয়। কালের আবর্তে মোহের নেশায় মাতাল হয়ে মানুষ স্বীয় দায়িত্ব পালনে বারবার স্খলিত ও বিচ্যুত হয়েছে। হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে মলিন করেছে আপন গরিমা ও গৌরব। বর্ণাঢ্য জীবন থেকে মুছে ফেলেছে যক্ষের ধন সমস্ত সুখ ও আনন্দ। অগণিত দুঃখরা এসে জীবনের অনুভূতি ও উপলব্ধিতে ভীড় জমিয়েছে। কষ্ট ও যন্ত্রণার জট মন্থর করে রেখেছে সম্মুখে এগিয়ে যাবার গতি। তাই সুখে থাকা ও সুখে রাখা স্বর্ণ মৃগয়া মনে করে সে ভুলতে বসেছে জীবনের ঠিকানা। উদ্ভট চাওয়া ও পাওয়ার হতাশা ও গ্লানি আষ্টেপৃষ্ঠে ধরেছে পথচলার অনুপ্রেরণা ও শক্তি। জীবনপথ রোধ করে বসে আছে সংসারের মায়া ও বোঝা। তাই মানুষের বেঁচে থাকার ইতিহাস হতে বিবর্ণ হয়ে গেছে আনন্দ ও উদ্‌যাপন।

মানুষ এখন আর নেহায়েতই নিজেকে ও অন্যকে গড়তে না পেরে তৈরী করছে যত অপসৃষ্টি। জীবন ক্রমশ বিলীন হয়ে যাচ্ছে, আর মৃত্যু নিশ্চিন্তে পা দোলাচ্ছে। হওয়া বা না-হওয়ার অসম বাসনা ও তৃপ্তি দিনে দিনে মানুষকে নি:স্ব করে দিচ্ছে। রিক্ততার সংস্কৃতি অহংকারে স্ফীত হয়ে উদ্যত দৈত্যের মতো মানুষের মাঝে আবাস গেড়েছে। তাই কারণে-অকারণে পাশবিকতা অতিথি বেশে আমাদের অস্তিত্ব জবরদস্তি করে দখল নিয়েছে, যেখানে অট্টহাসির আড়ালে নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতা চড়া দামে বিক্রি হয়। ঐশরিক ও মানবিক গুণাবলী নিভৃতে অজানায় কেঁদে ফিরে। ভালোমানুষী ভাঁড়ামি বলে গণ্য হয়। আওয়াজ তুলতে পারে না দুষ্টের বন্ধন ছিন্ন করার অনুপ্রেরণা ও সাহস। সবখানেই কেবল অসঙ্গতির দাপট। সততা ও ন্যায্যতা যেন এক পরাজিত সৈনিক। প্রেম ও দয়া কোন আবেদনই সৃষ্টি করতে পারে না। নোংরামির পৃষ্টপোষকতায় রুচিশীলতা পালিয়ে বেড়ায়। যেখানে মৃত্যুর অবাধ বিচরণ, সেখানে জীবন টিকে থাকতে পারে না। বিকৃত মানসিকতার কানাঘুষা মানুষের জীবন থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে মনুষ্যত্ব। নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার প্রতিযোগিতায় শুধুই আপনাকে শেষ করে দেয়ার শপথ। তাই আজ বিজয়ের মিছিলে পরাজয়ের শ্লোগান ধ্বনিত হয়। আশার প্রজাপতি কিছুতেই ধরা দিতে চায় না। সর্বত্রই যেন হতাশার পোস্টারে ছেয়ে গেছে। মানব অস্তিত্ব মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। অন্ধকারে জমে যাচ্ছে জীবনের রংধনু। আপন পরিচয় হারিয়ে অস্তিত্ব সংকট খুব বেশি হীন করে রেখেছে। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় মানুষ কেবলই অসার ভাবনা, অসৎ সঙ্গ ও অপকর্ম নিয়ে ব্যস্ত। পাপের দাসত্ব যে কত করুণ ও নৃশংস হতে পারে জীবনের পরতে পরতে তা বুঝিয়ে দিচ্ছে। বেঁচে থাকার স্বাদ এখন তিক্ত মনে হয়। তাই মৃত্যু জীবনের দ্বারে হিংস্রভাবে করাঘাত করে। সারাক্ষণ লালা কাটছে কখন শানিত থাবা বসিয়ে দিয়ে শেষ করে দিবে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান এই সুন্দর জীবন!

যখন স্বপ্নরা রঙ ছড়ায় না, মৃত্যুর হাতে রঙতুলি অবহেলিত, কিংবা জীর্ণতার স্পর্শে সমস্ত আয়োজন রঙহীন, তখন যিশু আসেন আমাদের জীবন রাঙ্গিয়ে দিতে যেন আমরা নতুন করে সৃষ্ট হতে পারি। মৃত্যুর গল্প মুছে দিতেই যিশু জন্ম গ্রহণ করেন যেন আমরা জন্মদিন উদ্‌যাপন করে আনন্দের সন্ধান করি ও সুখের বানে ভাসি। আনন্দময় সৃষ্টির আনন্দ পুনপ্রতিষ্ঠাকল্পে আপন আনন্দ বিলিয়ে দিয়ে আমাদের দুঃখ কুড়িয়ে বেড়ান। দুঃখবিলাসী ঈশ্বর আমাদের সমস্ত দুঃখ হরণ করে সুখের জীবন গেঁথে তুলেন। স্বর্গের রাজপুত্র পৃথিবীতে নেমে আসেন মর্তের কিঙ্করকে ঊর্ধ্বলোকে উঠিয়ে নিতে যেন মানব মৃত্যুর শোক রেখে নিরন্তন ঈশ্বরের রাজত্ব উপভোগ করতে পারে। যিনি আমাদের সব দিয়েছেন সেই যিশুর জন্য আমরা কি আমানত সঞ্চয় করেছি? পরাজয়, গ্লানি আর হতাশা ছাড়া আর কি-বা হতে পারে? তাই তো এত কিছু থাকা সত্ত্বেও আমরা যিশুকে পরিত্যক্ত এক জীর্ণ গোশালায় ঠাঁই দেই, ছেঁড়া বস্ত্রে জড়িয়ে রাখি, এঁটো বিচালিতে একটি যাবপাত্রে শুইয়ে দেই, পশু-পাখির সাথে প্রণাম জানাই আর বরণ করতে মাঠের রাখালদের ডেকে নিয়ে আসি। জীবনস্বামী যিশুকে দেয়ার মতো আমাদের কি আর কিছুই ছিলো না ? না, সত্যি বলতে কি আমাদের আর কিছুই ছিল না, কেননা সবকিছুই আমরা স্বার্থপরের ন্যায় নিজের জন্য অপব্যবহার ও অপচয় করে ফেলেছি। এখন নি:স্ব ও অসহায় আমাদের জীবন খাতার হিসেব একেবারেই শূন্য। আমরা তেমন কোন কিছুই খুঁজে পাই না, যা দিয়ে আমরা যিশুকে বরণ করতে পারি। কিন্তু তবুও যিশু আমাদের জীবনে প্রতিনিয়ত জন্ম নিতে চান যেন আমরা বারবার নিজেদের ফিরে পেতে পারি।

আমরা আমাদের প্রভুর জন্য যে হীন আয়োজন করেছি, তিনি আমাদের পরিত্রাণের নিমিত্তে সেই উৎসব কতই না মহৎ করে তুলেছেন! তিনি আমাদের পাপের শৃঙ্খল চূর্ণ করে দিয়েছেন। এখন আমরা মুক্ত ও স্বাধীন। তিনি কোন রকম প্রতিদান ছাড়াই আমাদের আপন করে নিয়েছেন। নিজের সবটুকু দিয়ে আমাদের ভালোবেসেছেন। যদিও তিনি আমাদের নিকট হতে কিছুই পাননি, তথাপি আমাদের জন্য সমস্ত কিছুই নিংড়ে দিয়েছেন। তিনি আমাদের গোশাল ঘরের পরিবর্তে স্বর্গে যাবার নিশ্চয়তা দান করেন; এক টুকরো ছেড়া বস্ত্রের বদলে ঐশ সন্তানত্বের মর্যাদা ও গরিমায় ভূষিত করেন; ব্যবহারের অনুপযুক্ত যাবপাত্রের পরিবর্তে অনন্ত সুখে স্থির রাখেন, পশু-পাখিদের বদলে ধূপ, ধুনো ও গন্ধ-নির্যাস উপহার প্রদান করেন, আর রাখালদের পরিবর্তে স্বর্গের দূতদের সেবা করতে প্রেরণ করেন। ঈশ্বর মানব পুত্র হয়েছেন যেন আমরা ঐশ সন্তান হতে পারি; ভঙ্গুরতা বরণ করেছেন যেন আমরা চিরস্থায়িত্ব আলিঙ্গন করতে পারি; দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করেছেন যেন আমরা সুখ ও আনন্দ উদ্‌যাপন করতে পারি; লজ্জাজনক মৃত্যু ও পরাজয় মেনে নিয়েছেন যেন আমরা অনন্ত জীবন ও বিজয় আঁকড়ে থাকতে পারি; অন্ধকারাচ্ছন্ন পাতালে নেমেছেন যেন আমরা আলোকোজ্জ্বল স্বর্গে উঠতে পারি। ঈশ্বর নর ও নারীকে আপন প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন। পাপ-পঙ্কিলতায় জর্জরিত মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা মানবকে উদ্ধার করতে তিনি মানুষ হয়েছেন। যদি মনে প্রশ্নের উদয় হয় যে, ঈশ্বরের স্বরূপ কেমন, তাহলে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ঈশ্বর দেখতে অবিকল আমার আর আপনার অনুরূপ, কেননা তিনি আমাদেরকে নিজের মতো করে সৃষ্টি করেছেন এবং নিজেকে আমাদের সদৃশ করে জন্ম নিয়েছেন। তিনি আপন ঘর ছেড়েছেন যেন আমরা ঈশ্বরের ঘরে আশ্রয় নিতে পারি। তাই যিনি আমাদের জন্য নিজের আবাস ত্যাগ করেছেন, তিনি কি আমাদের হৃদয়ে বসবাস করতে পারেন না? নিশ্চয় পারেন! এতে কোন সন্দেহ থ াকার অবকাশ নেই। তাই প্রভু যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন আমাদের সকলের বড়দিন, কেননা এ দিনে স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের জীবনে নেমে আসেন, আমাদের মাঝে বাস করেন ও আমাদের সাথে যাত্রা করেন। ঈম্মানুয়েল, অর্থাৎ ঈশ্বর আমাদের সঙ্গেই আছেন বলে বড়দিন আমাদের জন্য এত বেশি আনন্দের ও সুখের উৎসব। আসুন, আমরা শিশু যিশুকে আমাদের জীবনে বরণ করে নেই এবং তার সাথে আনন্দে বসবান করি।

“যিশুর পবিত্র হৃদয়” সর্বজনীন ও সীমাহীন ভালোবাসার উৎস

রনেশ রবার্ট জেত্রা

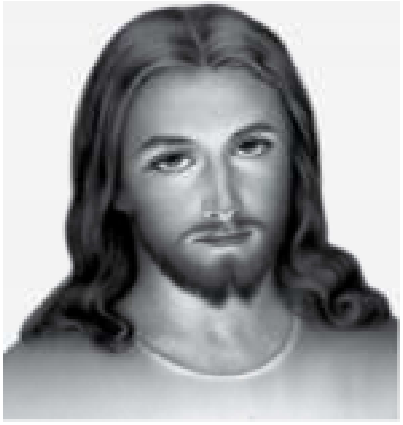

জুন মাস যিশু হৃদয়ের মাস। যিশুর পুণ্য হৃদয় হলো সর্বজনীন ভালোবাসার উৎস। তাঁর ভালোবাসা সীমাহীন। যিশুহৃদয় এমনই এক হৃদয়, যে হৃদয়ে রয়েছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, পাপী-তাপী নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি অকৃত্রিম এক সীমাহীন ভালোবাসা। সেই সর্বজনীন ভালোবাসার উৎস যিশুর পুণ্য হৃদয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে প্রতি বছর মাতামণ্ডলী যিশুর পুণ্য হৃদয়ের পর্ব পালন করে আসছে। বর্তমান বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাসের ফলে পৃথিবীর মানুষ আজ হতাশা ও নিরাশাগ্রস্ত। এই মহামারী পরিস্থিতিতেও খ্রিস্টভক্তগণ যিশু হৃদয়ের প্রতি কোনো ক্রমেই ভক্তি ও বিশ্বাস হারায়নি। তাই প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরেও মাতামণ্ডলী পালন করতে যাচ্ছে ‘যিশুহৃদয়ের মহাপর্ব’। যিশু হৃদয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি জানিয়ে মণ্ডলীতে এবছর তা পালিত হবে জুন মাসের ১১ তারিখ। সর্বজনীন ভালোবাসায় তিনি নিজেকে রিক্ত করলেন।

হৃদয় হলো ভালোবাসার প্রতীক। ভালোবাসার অর্থ হলো- ভালো বাসনা বা অন্যের ভালো বা মঙ্গল করা। যিশু ভালোবাসা মানবজাতির জন্য সর্বদা মঙ্গলদায়ক। মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ দিয়েছেন ক্রুশে আত্মদানের মধ্যদিয়ে। তিনি মানুষকে এতই ভালোবেসেছেন যে, তিনি ক্রুশীয় মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করে নিলেন। যিশু হৃদয়ের ভালোবাসা প্রকৃত এবং উত্তম এক সর্বজনীন ভালোবাসা। যা আমরা পবিত্র বাইবেলের বিভিন্ন ঘটনায় দেখতে পাই। যুদা ইস্কারীয়ত যিশুর সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করা সত্ত্বেও তিনি তাঁকে ক্ষমা করতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। যিশুর প্রকৃত ভালোবাসা আমরা বাইবেলের আরেক জায়গায় দেখতে পাই যেখানে তিনি ক্রুশ থেকে মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শত্রুদের ক্ষমা করেছন *(লুক ২৩:৩৪)*। যিশুর হৃদয় এমনই ভালোবাসায় পূর্ণ ছিল যে, তিনি শত্রুদের ক্ষমা করে মানবজাতির জন্য ভালোবাসার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়েছেন এবং মানবজাতিকেও তাঁর মতো করে শত্রুকে ভালোবাসার নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেছেন, “ আমি তোমাদের বলছি: তোমরা তোমাদের শত্রুকে ভালোবাসবে, যারা তোমাদের ঘৃণা করে তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর” *(মথি ৫:৪)*। যেহেতু তিনি প্রকৃত ভালোবাসার উৎস, সেহেতু আমরা যখন তাঁর মতো আমাদের শত্রুদের ক্ষমা করি এবং ভালোবাসি, তখন আমরা তাঁর প্রকৃত সন্তান হয়ে উঠি। বাস্তবে শত্রুকে ক্ষমা করা ও ভালোবাসা আমাদের অনেকের জন্য কঠিন একটি কাজ। কিন্তু যিশু হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে তাঁর ভালোবাসা আমাদের অন্তরে উপলব্ধি করে এবং তাঁর ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে আমরা সহজে শত্রুকে ক্ষমা করে ভালোবাসার বন্ধনে বাঁধতে পারি।

যিশু হৃদয়ের ভালোবাসা স্বার্থহীন অর্থাৎ নিস্বার্থ ভালোবাসা। তিনি কাউকে কোনো স্বার্থের জন্য কোনোদিন ভালোবাসেননি। বরং মানুষের পরিত্রাণের জন্য তিনি ক্রুশমৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ডেল কার্নেগি বলেছেন- “পৃথিবীতে ভালোবাসার একটি উপায় আছে, সেটা হলো প্রতিদান পাওয়ার আশা না করে ভালোবেসে যাওয়া।” অর্থাৎ উক্তিটি সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায় এই ভাবে, প্রতিদান পাওয়ার আশা না করে ভালোবেসে যাওয়া। অর্থাৎ যে ভালবাসার কোনো স্বার্থ থাকবে না। ক্রুশীয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নিস্বার্থ ভালবাসার প্রমাণ দিয়েছেন স্বয়ং খ্রিস্ট। ধনী-গরীব, পাপী-তাপী, জাতি-বিজাতি বা বিধর্মী, অসহায়, অভাবী ও অবহেলিত, তিনি সবাইকে একই ভ্রাতৃবন্ধনে ভালোবেসেছেন ও মর্যাদা দিয়েছেন এবং তা তিনি নিস্বার্থভাবেই করেছেন। যা আমরা পবিত্র বাইবেলে মেরী ম্যাগদালীন *(যোহন ৮:৩-১১)*, সামারীয় নারী *(যোহন ৪:১-৩০)*, জাখেয় *(লুক ১৯:১-১০)* এবং করগ্রাহক মথি *(৯:৯-১৩)* প্রমুখদের জীবনে দেখি যে, তারা প্রত্যেকেই যিশুর ক্ষমা পেয়ে তাঁর হৃদয়ের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে নবজীবন লাভ করেছে।

যিশু হৃদয়ের ভালোবাসার মাহাত্ম্য দেখে আমাদের অবাক হতে হয় যে, কত উদার ও মহৎ তাঁর হৃদয় । যে হৃদয়ে রয়েছে নিশর্ত ভালোবাসা। তিনি শর্ত ছাড়াই সবাইকে ভালোবাসলেন । তাকে ভালোবাসলে তিনি যে আমাদের ভালোবাসবেন এমন কোনো শর্ত ছিল না তাঁর ভালোবাসায় । বরং তিনিই প্রথমে আমাদেরকে ভালোবাসলেন। কারণ তিনি প্রেমস্বরূপ *(১ম যোহন ৪:৮)*। বাইবেলের ভাষ্য মতে, “আমাদের প্রতি পরমেশ্বরের ভালোবাসা তাঁর একমাত্র পুত্র যিশু খ্রিস্টকে আত্ম বলিদানের মধ্যদিয়েই প্রকাশিত হয়েছে”*(১ম যোহন ৪:৯-১০)*।

আমরা কেউ কোনদিন পরমেশ্বরকে দেখিনি এবং তিনি যে আমাদের অন্তরে বা হৃদয়ে রয়েছেন তা একমাত্র আমরা উপলব্ধি করতে পারি পরস্পরকে ভালোবাসার মধ্যদিয়ে *(১ম যোহন ৪:১২)*। পরস্পরকে ভালোবাসার মধ্যেই ঈশ্বর প্রেমের পূর্ণতা নিহিত। যিশু হৃদয়ের সাথে আমাদের হৃদয়ের তুলনা করে দেখা যাবে যে, তাঁর হৃদয় ও আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান রয়েছে। এর মূল কারণ আমরা পরস্পরকে নিশর্তভাবে ভালোবাসতে পারি না বা অবহেলা করি। আমরা যখন কাউকে ভালোবাসতে যাই, তখন সেখানে অনেক সময় শর্ত দিয়ে থাকি। অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশে আমাদের কিছু শর্ত থাকে। যিশু হৃদয় আমাদের আহ্বান করে আমরা যেন তাঁর হৃদয়ের মতো পরস্পরকে শর্তহীনভাবে ভালোবাসি।

যিশু হৃদয়ের ভালোবাসা সীমাহীন। তাঁর ভালোবাসায় নেই কোনো সীমা । সকলের জন্যই তাঁর ভালোবাসা। তবে মানুষের ভালোবাসায় কেন এতো সীমা বা পরিসীমা? এই প্রশ্নের উত্তরে কারণ হিসেবে আমরা হয়তো অনেকেই বলে থাকি যে, আমরা রক্ত মাংসের মানুষ তাই আমাদের মধ্যে তা সম্ভব হয় না। আমাদের ভালোবাসা স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বিধায় আমরা সকলকে যিশুর মতো ভালোবাসতে পারি না। সকলকে ভালোবাসা রক্ত-মাংসের মানুষ হিসেবে হয়তো কঠিন কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে বলব যে,যিশু হৃদয়ের মতো আমরাও তখনই সর্বজনীনভাবে ভালোবাসতে সক্ষম হবো, যখন আমরা পরম সহায়ক পবিত্র আত্মার সহায়তা যাচ্না করব এবং পবিত্র আত্মাকে আমাদের অন্তরে কাজ করতে হৃদয়-মন উন্মুক্ত করে দিবো। কারণ, পবিত্র আত্মা আমাদের প্রতি ঈশ্বরের একটি বিশেষ দান। পবিত্র আত্মাই মানুষকে ভালোবাসতে অনুপ্রাণিত করেন এবং শক্তি সাহস দান করেন । আমাদের মানব জাতির মতো তিনি তাঁর হৃদয়ের ভালোবাসা সীমাবদ্ধতায় রাখতে চাননি। তিনি সকলের জন্যই তাঁর হৃদয়ের ভালোবাসা চিরস্থায়ীভাবে প্রকাশ করেছেন নিজেকে ক্রুশে বলিদানের মধ্য দিয়ে ।

বর্তমান বাস্তবতায় ভালোবাসার যে কতো প্রয়োজন তা আমরা হয়তো অনেকেই উপলব্ধি করছি। বর্তমান ভোগবাদী পৃথিবীতে মানুষ বড়ই স্বার্থপর। বর্তমানে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের সুযোগ যেখানে রয়েছে, সেখানে

মাত্র ভালোবাসার প্রকাশ লক্ষ্যণীয়। দেশের মধ্যে বা দেশের বাইরে, সমাজে, রাষ্ট্রে এবং অনেক পরিবারে আজ স্বার্থপরতা, লোভ-লালসা, মারামারী, একে অপরকে ক্ষমা করতে না পারা, ক্ষমতার অপব্যবহার, এক জাতি অন্য এক জাতির সাথে দ্বন্দ্ব-কলহ বিবাদে বিভক্ত। আসলে এই সমস্ত কিছু মানুষের মধ্যে তখনই ঘটে যখন সে মানুষের বা ব্যক্তির মধ্যে ভালোবাসা অনুপস্থিত থাকে। মানুষ ঈশ্বরের ভালোবাসায় এবং তাঁরই সাদৃশ্যে সৃষ্ট হয়েছে। তাই মানুষই পারে ভালোবাসা দিতে এবং ভালোবাসা পেতে। মানবীয় ভালোবাসা স্বর্গীয় ভালোবাসারই প্রতিফল। অর্থাৎ মানুষকে ভালোবাসার মধ্যেই স্বর্গীয় ভালোবাসা নিহিত। মানুষকে ভালোবাসার উৎস স্বয়ং যিশুহৃদয়। অর্থাৎ তিনি ভালোবাসাময়। তাঁর ভালোবাসাতে রয়েছে ক্ষমা, সহযোগিতা, সহভাগিতা, একতা, মিলন, সহানুভূতি প্রভৃতি। যেহেতু মানুষ তাঁরই সাদৃশ্যে সৃষ্ট, সেহেতু মানুষের মধ্যেই এই মানবীয় গুণাবলীগুলি বিদ্যমান। সেখানে শুধু চর্চার প্রয়োজন । আমরা যখন এই মানবীয় গুণগুলো মানুষের মঙ্গলের জন্য চর্চা বা মানুষের প্রতি প্রকাশ করি তখন আমরা যিশুর হৃদয়ময় হয়ে উঠি। সাধু আথানাসিউস বলেছেন- "ঈশ্বর মানুষ হলেন যাতে মানুষ ঈশ্বর হয়"। আর সত্যিই ঈশ্বর মানব দেহ ধারণ করলেন এবং মানুষের মতো জীবন-যাপন করেই ভালোবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ দিলেন ক্রুশীয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার মধ্যদিয়ে এবং সেই ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে প্রতিবেশীর সাথে সে ভালোবাসা সহভাগিতা করার নির্দেশ দিয়ে গেলেন।

সাধু আথানসিউসের ভাষ্য মতে, আমরা তখনই ঈশ্বরময় হয়ে উঠি যখন আমরা তা নিজেদের জীবনে যিশুহৃদয়ের ভালোবাসা উপলব্ধি করি এবং প্রতিবেশী ভাই-বোনদের মাঝে সহভাগিতা করি।

বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাসে বিশ্ব আজ হতাশা ও নিরাশাগ্রস্ত। বিশ্ব আজ অসহায়। মানুষ আজ জীবন নিয়ে বাঁচা-মরার লড়াই করছে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বের মানুষ আজ যিশুহৃদয়ের ভালোবাসা বিশেষভাবে উপলব্ধি করছে। বিজ্ঞান প্রযুক্তি আজ করোনার কাছে হার মেনে নিচ্ছে। তাহলে কোথায় আমাদের শক্তির উৎস? আমাদের জীবনের শক্তির উৎস হলেন স্বয়ং খ্রিস্টের ভালোবাসা। এই ভালোবাসা নামক শক্তিই পারে পৃথিবী থেকে করোনা ভাইরাসকে নির্মূল করতে। কারণ,যিশু হৃদয়ের ভালোবাসায় রয়েছে-ক্ষমা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, একতা-মিলন, সাহায্য-সহযোগিতা, সহভাগিতা এবং একে-অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রভৃতি। তাঁর হৃদয়ের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে তা প্রতিবেশীর সাথে সহভাগিতা করার জন্য তিনি আজ আমাদের আহ্বান করছেন। আমাদের ভালো থাকাটা প্রকৃত পক্ষে অন্য ভাই-বোনের ভালো থাকার ওপর নির্ভর করছে। কারণ আমাদের মানব সমাজের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একে অপরের উপর নির্ভরশীলতার সম্পর্কে। বাস্তবতার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে, আমরা ভালো নেই। এর মূল কারণ হলো- আমার প্রতিবেশী ভাই-বোন আজ ভালো নেই। মহামারীর ফলে মানুষ আজ অসহায়। ধনী-গরীব সবই আজ মানুষের ভালোবাসার প্রত্যাশী। তাই করোনাভাইরাসের ফলে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, নির্বিশেষে অনেক মানুষই আজ নিজ নিজ ধর্মীয় গণ্ডির ঊর্ধ্বে এসে মানুষের জীবন বাঁচিয়ে রাখতে এবং মানুষের কল্যাণ কাজে অনেকেই নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, যুব ও তরুণ সমাজ আজ নিজেদেরকে মানবসেবায় সম্পৃক্ত করছে। সেখানে আজ কোনো জাতি, ধর্ম-বর্ণ মানছে না। তাদের এই সহভাগিতা-সহযোগিতা ও একাত্মতার মধ্য দিয়ে যিশু হৃদয়ের সর্বজনীন ভালোবাসাই প্রকাশ পায়। আবার, কিছু স্বার্থপর ও ভোগবাদী সমাজের লোক রয়েছে যারা এই মহামারীর সময়েও নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ নিয়েই ব্যস্ত। এর মূল কারণ হচ্ছে তাদের মধ্যে ভালোবাসা বলে কিছু নেই। তাদের ভালোবাসায় রয়েছে সীমাবদ্ধতা বা সীমানা বেষ্টনী। কারণ নিজের পরিবার ও আত্মীয়- স্বজনদের মধ্যে তাদের ভালোবাসা সীমাবদ্ধ। জুন মাসকে যিশু হৃদয়ের কাছে উৎসর্গ করে মাতামণ্ডলী আমাদেরকে এই সুযোগই করে দিচ্ছেন যে, আমরা যেন যিশুহৃদয়ের প্রতি আরো গভীর বিশ্বাস, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, পরস্পরের সাথে তাঁর ভালোবাসা সহভাগিতার মধ্য দিয়ে। যিশুর হৃদয় আমাদেরকে আজ অভাবী, নির্যাতিত, অসহায়, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের পাশে দাঁড়াতে আহ্বান করছেন এবং আমাদের ভালোবাসার সীমানা গন্ডি পেরিয়ে আমরা যেন সর্বজনীন ভালোবাসায় নিজেদের হৃদয়-মন উন্মুক্ত করি।

আসুন, আমরা যিশু হৃদয়ের ভালোবাসায় স্নাত হয়ে পরস্পরের সাথে তা সহভাগিতা করি এবং তাঁর ভালোবাসায় নিহিত ক্ষমা, দয়া, সহানুভূতি, শ্রদ্ধা ও সম্মান ,একতা-মিলন এবং সহযোগিতা-সহভাগিতার চর্চা নিজেদের জীবনে বৃদ্ধি করি। নিজেকে যেভাবে ভালোবাসি, অন্যকেও যেন সেভাবে ভালোবাসি। জাতি, ধর্ম,বর্ণ, পাপী-তাপী, অসহায় ও অভাবী নির্বিশেষে সকলকে একই ভ্রাতৃপ্রেমের বন্ধনে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে সর্বজনীন ও সীমাহীন ভালোবাসার হৃদয় গড়ে তুলি। আসুন প্রতিবেশীকে নিজের মতো করে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে যিশুর পুণ্য হৃদয়ময় হয়ে উঠি। ৯০

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

১. পবিত্র মঙ্গলবার্তা বাইবেল

২. প্রতিবেশী প্রকাশনী (বর্ষ: ৮০,সংখ্যা: ২০,

৩. ২০২০খ্রি: সম্পাদকীয়)

৪. ঈশ্বর ভালোবাসা (সাধু বেনেডিক্ট মঠ প্রকাশনী ২০০৮ খ্রি:)

সমবায় নির্বাচন

পিটার রোজারিও

সমবায় আন্দোলন মাঠ হয় সরগরম
তিন বছর অন্তর যখন আসে নির্বাচন।
শহর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে শহরে
বিচিত্র হাওয়া বয় নির্বাচনী প্রচারে।
ইলেকশন হবে নাকি সিলেকশন?
এ নিয়ে ভাবে বিভিন্ন নেতাগণ।
সবায় চায় ক্ষমতা, কে শোনে কার কথা।
গঠন হয় দল, দেখে না তার যোগ্যতা।
"ন্যায় সত্য সুন্দর" ব্যানার নিয়ে ঘুরে সবার দ্বারে
সত্যিকার কথায় মূল্য তা কী কেউ ভাবে?
তিনটি কথা মাথায় রেখে ক্ষমতায় আসো
পালন করবে তিনটি কথা এই প্রতিজ্ঞা করো।
রক্ষা করা পবিত্র দায়িত্ব সদস্যদের মূলধন
নির্বাচনী ইস্তেহারের প্রতিটি কথা করো পূরু।
বহু নেতার হয় আবির্ভাব নির্বাচনকালীন
ক্ষমতায় এসে কিছুদিন পর হয়ে যায় বিলীন।
ভোট দেওয়ার অধিকার সকল সদস্যের আছে
প্রলোভনে পড়ে কেউ ঘুরোনা কারো পাছে।
ভোট নিয়ে হয় অনেক পরিবারে অশান্তি
তার প্রতিক্রিয়া ছড়ায় প্রতিটি বাড়ী-বাড়ী।
বড় বড় সভা করে দেয় অনেক প্রতিশ্রুতি
ক্ষমতায় আসার পর সবই যায় ভুলি।
চুপি চুপি কথা বলে দেয় সুন্দর বুলি, আশা দিয়ে
সদস্যদের করে বিভ্রান্তি। টাকা পয়সার
ছড়াছড়ি রঙ্গিন পানি ঢালাঢালি
এভাবেই লোভ দেখায়ে ভোট করে বেচাকিনি।
যুব ভাইরা আমাদের সমাজের সম্পদ
সুপথে চালাতে হবে এরা যে দেশের ভবিষ্যৎ।
দেখে শুনে যোগ্য ব্যক্তিকে প্রয়োগ কর ভোঁ
এতে করে গঠন হবে সুন্দর যোগ্য বোর্ড।
নির্বাচনে জয় পরাজয় আছে সকলেই তা জানি
মেনে নিয়ে আলিঙ্গন কর মুছে যাবে গ্লানি।
বিজয়ের পর সকলে মিলে কর আনন্দ উল্লাস
পরাজিত হবে যারা, তারা যেন না হয় হতাশ।
এভাবে কর সুন্দর দৃস্টান্ত স্থাপন
তাতেই হবে স্বার্থক সমবায়ের আন্দোলন।

সাধু যোসেফ-বর্ষে করণীয় কিছু দিক

ফাদার সুশীল লুইস

মণ্ডলীতে সাধু যোসেফকে "বিশ্বমণ্ডলীর প্রতিপালক" ঘোষণার ১৫০ বছর পূর্তিতে ২০২০ এর ৮ ডিসেম্বর থেকে ২০২১এর ৮ ডিসেম্বর সাধু যোসেফের-বর্ষ ঘোষণা করেন পোপ ফ্রান্সিস। মণ্ডলীতে তাঁর স্মরণে একটি মাত্র মহাপর্ব ও একটি স্মরণ দিবস রয়েছে। কিন্তু অন্য দিকে মারীয়ার সম্মানে ও স্মরণে অনেকগুলি মহাপর্ব, পর্ব ও ঐচ্ছিক বা অনৈচ্ছিক স্মরণদিবস রয়েছে। সাধু যোসেফের বিষয়ে আমরা বেশি জানি না, তার বিষয়ে বেশি বলাও হয়না, পড়ার জন্য তার বিষয়ে বেশি লেখাও নেই।

যাহোক, বাংলাদেশে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের লৌকিক ধর্মাচরণ রয়েছে। তার মধ্যে একটি হল সাধু সাধ্বীদের প্রতি ভক্তি-ভালবাসা। কারণ ঈশ্বর তাঁর প্রিয় সেবক-সেবিকা অসংখ্য সাধু সাধ্বীকে নানা ধরনের ক্ষমতা, শক্তি প্রদান করেছেন। স্বর্গীয় সাধু সাধ্বীদের প্রতি গভীর আন্তরিকতা বাংলার মানুষের রক্তে রক্তে প্রবাহিত, অন্তরে জাগ্রত। সেভাবে সাধুদের আশ্রয় গ্রহণ করা তাদের মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করা মানুষের অন্তরের সম্পদ। সে ভক্তির প্রভাবে এদেশে যুগে যুগে বিচিত্র সাধু-ভক্তি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। যেমন মারীয়া ভক্তি, আন্তনী ভক্তি, তেরেজা ভক্তি প্রভৃতি। সাধুদের স্মরণে তারা বিভিন্ন কিছু করে থাকে। যেমন; পর্ব পালন, প্রার্থনা, তীর্থ, শোভাযাত্রা, মূর্তি স্থাপন, বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার...।

সাধু যোসেফের বছরে ব্যক্তি, দল, পরিবার ও প্রতিষ্ঠানে অনেক কিছু করা যেতে পারে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে। এ বিষয়ে কিছু মতামত, চিন্তা, প্রস্তাব, সম্ভাব্যতা লিখতে চেষ্টা করছি।

প্রথমে বলতে হয়; মণ্ডলী ঘোষিত সাধু যোসেফের বর্ষ বিষয়ে ভক্তদের ভালভাবে জানানো প্রয়োজন যেন তারা তা জেনে সে বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে ভালভাবে তা পালন করতে পারে। সকল বিশ্বাসী যেন সাধু যোসেফের সঠিক জীবন উপলব্ধি করতে পারে। বিশ্বাসীবর্গ স্থান-কাল-পাত্র ভেদে অনেক কিছু করতে পারে। পবিত্র বাইবেলে তার বিষয়ে পড়া ও সেসবে অনুপ্রাণিত হয়ে ভক্তগণ যোসেফের প্রতি নানাভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারে। যেমন: প্রার্থনা, সভা-সম্মেলন, ধর্মশিক্ষা, ক্লাস, অলোচনা, নভেনা, নাটক-নাটিকা, তাঁর গান রচনা, পর্ব পালন, লেখা ও পত্রিকা প্রকাশ, প্রার্থনা কার্ড করা, পরিবারে তার মূর্তি ও ছবি রাখা, অঞ্চলে অঞ্চলে তাঁর মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা করা, সহজভাবে তার জীবনী প্রকাশ ও পাঠ, বিভিন্ন দিনে-উপলক্ষে সাধু যোসেফের মূর্তি সুন্দর ক'রে সাজানো ইত্যাদি।

বুধবার বিশেষ প্রার্থনা ও খ্রিযাগ করা, এদিন সাধু যোসেফের মধ্যদিয়ে প্রার্থনা করার দিন। বিভিন্ন দিনে তার স্মরণে খ্রিস্টযাগ করা। তার নামে উৎসর্গীকৃত প্রতিষ্ঠানে ঘটা করে প্রতিপালকের পর্বদিন করা যেতে পারে। বিভিন্ন সংঘ, দল, সাধু যোসেফের মধ্যস্থতায় বিশেষ প্রার্থনা করতে পারে। সাধু যেসেফের নামে আরো প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা, সাধু যোসেফের সম্মানে আরো কার্যক্রম প্রচলন করা যেতে পারে।

যাদের নাম যোসেফ তাদের দিন ক্ষণ বুঝে তাদের শুভেচ্ছা জানানো যেতে পারে, সাধু যোসেফের গুণসমূহ অনুশীলন করতে অন্যদের উৎসাহিত করা যেতে পারে, পবিবারের ব্যস্ততায় তাঁকে বার বার ডাকা যেতে পারে। তার তীর্থস্থানে তীর্থ করা, ধর্মীয় অনুশীলনসমূহ চর্চা করা।

প্রতিদিন সকালে যোসেফের মূর্তির সামনে ফুল রেখে প্রার্থনা করা যেতে পারে। যোসেফ শব্দটি লিখে সুন্দর করে ফুল দিয়ে সাজানো যেতে পারে। তাঁর আদর্শ ও কোন গুণ অনুসরণ করা যেতে পারে, আলোকচিত্রে তার জীবনী প্রদর্শন করা হতে পারে। 'পরিবারের প্রতিপালক সাধু যোসেফ'- এ বলে প্রতি পরিবার প্রার্থনা করতে পারে। স্থানে স্থানে সাধু যোসেফের সম্মানে ও স্মরণে মূর্তি স্থাপন করা যেতে পারে।

বিভিন্ন সময়ে অনুদান দেয়া, কোন দয়ার কাজ করা, কোন কাঠামো তৈরী করা, পাপস্বীকার করা, নির্জন ধ্যান করা, কোন প্রায়শ্চিত্ত ও ত্যাগস্বীকার করা সম্ভব। গ্রামের প্রবেশ পথে সাধু যোসেফের মূর্তি স্থাপন করা সুন্দর একটি পদক্ষেপ হতে পারে। প্রতি পরিবারে সাধু যোসেফের বেদী স্থাপন করা ও সেখানে ভক্তি প্রদর্শন করা। দেশীয়ভাবে সাধু যোসেফের প্রার্থনাগৃহ/মন্দির নির্মাণ করা, সেখানে দেশীয় সবুজ রং ও ফুল, কাপড়, বাটি প্রভৃতি ব্যবহার হতে পারে। পর্বের আগে সাধু যোসেফের সম্মানে কোন সন্ধ্যায় হারিকেন নিয়ে শোভাযাত্রা করা যেতে পারে। কারণ সাধু যোসফের জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে রাতে।

এলাকায় সাধু যোসেফের প্রার্থনাদল গঠন করা যেতে পারে। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে উপাসনায় নিজেদের ভাষা ব্যবহার করা যায়। গানের দল গঠন করা, নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি অনুসারে গান করা, নতুন গান রচনা করা সেসবে তারা আকৃষ্ট হয়ে আরো ভক্তি নিয়ে সাধু যোসেফকে স্মরণ করতে পারে। যোসেফের বিষয়ে গানে প্রচার করা যেতে পারে। উপাসনায় এমন গান বাছাই করতে হবে যে গানের মধ্যে বিশেষ গাম্ভীর্য আছে, যেন সেসব গান শুনে লোকদের হৃদয়-মন সাধু যোসেফের প্রতি ভক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

শিশুদের মধ্যে সাধু যোসেফের ধারণা দান করা, চিঠি, কবিতা, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, যোসেফের অভিনয় করা যেতে পারে।

পর্বের পূর্বে নভেনা করা, তাতে ভক্তদের অংশগ্রহণ বাড়ানো দরকার, পর্বের দিন মূর্তি সাজিয়ে বিশেষ শোভাযাত্রার মাধ্যমে প্রার্থনা করা ভক্তি প্রকাশ করা, এসব তাদের ভক্তি বিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে।

সাধু যোসেফের নামে প্রতিষ্ঠানে জড়িত ব্যক্তিগণ, গ্রামবাসী নভেনা করতে পারে, সাধু যোসেফের নামে সারাদিন রোজা/উপবাস রাখা যেতে পারে, প্রার্থনা করা, কোন বিশেষ উদ্দেশে কয়েকজন সেভাবে করতে পারে, দেশীয় উপকরণে রোজা/উপবাস ভাঙ্গা সম্ভব, কোন সংকটময় সময়ে যোসেফকে স্মরণ করা ও তাঁর মাধ্যমে প্রার্থনা করা যেতে পারে; যেমন বর্তমানের করোনাকালীন সময়ে "পীড়িতদের আশা" যোসেফকে বার বার ডাকা যেতে পারে।

যোসেফ সংঘ গঠন করা, তার আদর্শ অনুসরণ ও অনুকরণ করা, প্রার্থনা-সেবাকাজ করা সদস্যদের বিশেষ লক্ষ্য হতে পারে। সদস্যদের তাদের নিজস্ব পোশাক থাকা সুন্দর লক্ষণ হতে পারে। সাথে সাথে যোষেফ ভক্তি দেশীয় করণ, অলংকরণ, ফসলদান, যোসেফের মাধ্যমে প্রার্থনা করতে ভক্তদের উৎসাহিত করা যেতে পারে।

যোসেফকে ঘিরে, পরিবারে, সমাজে, গির্জায়, মণ্ডলীতে হৃদয়ে তার আসন প্রস্তুত করা সম্ভব, তাঁকে আপন ক'রে নেয়া সম্ভব, তাঁর আশীর্বাদ চাওয়া যায়, যোসেফ যেন সবার পালক, রক্ষক, পিতা, মধ্যস্থতাকারী হন; ছোট-বড়, ধনী-গরীব, দেশী-বিদেশী, আদিবাসী সবার।

তাঁকে ঘিরে অনুধ্যান, সহভাগিতা, ধ্যান প্রার্থনা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। নিজস্ব ভাষায় সাধু যোসেফের বিষয়ে কিছু কথা, তাঁর আশ্চর্য কাজের কিছু ঘটনা, বিভিন্ন গুণ উপস্থাপন করা যোসেফের প্রতি ভক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে বলে মনে করি। সেভাবে ধীরে ধীরে মানুষদের মধ্যে বিশ্বাস ও ভক্তিভাব তৈরী করা যেতে পারে, একই সাথে নিজস্ব ভাষায় সহভাগিতা, প্রার্থনা, উপদেশ প্রভৃতি সাধু যোসেফের প্রতি ভক্তিভাবকে দেশীয়করণে করতে সহায়তা করবে, সাজানো দেশীয় জিনিস দিয়ে করলে ভাল লাগবে, কাসা পিতলের জিনিস, দেশীয় ফুল, দেশীয় তেলের বাতি ব্যবহার উপাসনাকে নানাভাবে প্রভাবিত করবে।

ঘরে সাধু যোসেফের মূর্তি স্থাপন করা, নিয়মিত সেখানে বাতি জ্বালানো ও বিশ্বাসসহ প্রার্থনা করা যেতে পারে। সাধু যোসেফকে সেখানে এমনভাবে সাজাতে হবে যেন মানুষ তার

মূর্তি দেখে বলতে পারে যে, এ আমাদের সাধু যোসেফ, সাধু যোসেফের প্রার্থনার পূর্বে পরিবেশ সুন্দর পরিচ্ছন্ন করলে মানুষের ভক্তিভাব জাগবে, সেজন্য আলপনা, লেখা, দেওয়াল চিত্র, দেশীয় তাজা ফুল প্রভৃতি দিয়ে স্থান সাজানো যেতে পারে।

ফাদার সিস্টারগণ বাণী প্রচার করতে, সাধু যোসেফের ভক্তি বাড়াতে যোসেফের বছর পালন করতে সবার সামনে গুতত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন, কারণ ভক্তগণ ফাদারদের খোলামনে শোনে ও গ্রহণ করে, তাই এসব ক্ষেত্রে ফাদার সিস্টারদের আরো সচেতন ও তৎপর হওয়া প্রয়োজন। যে ভাবে মে ও অক্টোবর মাসে মারীয়ার সম্মানে প্রার্থনা করা হয় সেভাবে মার্চ মাসে যোসেফের স্মরণে ও মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করা যায়। সাধু যোসেফের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন খুবই আনন্দের বিষয়। তাই এ ব্যাপারে আরো উদ্যেগ, সচেতনতা ও যত্নের প্রয়োজন রয়েছে যেন আরো বেশি ফলপ্রসূতা আনা সম্ভব হয়। মারীয়ার ক্ষেত্রে যেমন যোসেফের সম্মান ও স্মরণেও আরো কিছু প্রার্থনা মণ্ডলীতে প্রচলিত হলে ভক্তদের জন্য অনেক সুবিধা হতো। ভক্তগণ বার বার তাঁর মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করতে পারতেন।

ভক্তগণ বার-বার মণ্ডলী, সকল মানুষ ও পরিবারের মঙ্গলের জন্য "সংসার জীবনের ভূষণ" সাধু যোসেফের মধ্যস্থতায় অনেক প্রার্থনা করতে পারে। বিশেষভাবে পরিবার ও মণ্ডলী যেন সকল মন্দতা, ভ্রষ্টতা ও সংকট থেকে সব সময় দূরে থাকতে পারে আর পবিত্র জীবন যাপন করতে পারে।

বিশেষ বিশেষ সময়ে আনুষ্ঠানিক শোভাযাত্রার মাধ্যমে "সংসার ধর্মের পালক" সাধু যোসেফের মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করা যেতে পারে; পরিবারের জন্য, অসুস্থ্যতার জন্য, মণ্ডলীর জন্য সাধু যোসেফের মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা ক'রে প্রার্থনা করা যেতে পারে। এ প্রার্থনার সময়ে বিভিন্ন বাড়ীতে সাধু যোসেফের আসন তৈরী করা যেতে পারে এবং প্রার্থনার সময়ে ভক্তগণ বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন মিনতি যোসেফের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে তুলে ধরতে পারে। সাথে সাথে বিভিন্ন উপহার সাধু যোসেফের মূর্তির পদতলে রাখতে পারে। সাধু যোসেফের মধ্যস্থতায় প্রার্থনায় বিভিন্ন উদ্দেশ্য রাখা যেতে পারে যেগুলি সম্পূর্ণ দেশীয় ভাবধারাপূর্ণ হবে, যেমন দেশের মানুষের জীবনে শান্তি, উন্নতি কামনা করে, দেশের বিভিন্ন সমস্যা-সংকটে, সংগ্রামে, প্রার্থনার আয়োজন করা যেতে পারে।

সাধু যোসেফের স্তব দেশীয় সুরে গান করা যেতে পারে। দেশীয় কৃষ্টি অনুসারে সাধু যোসেফের চিত্রাংকন, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য সৃষ্টি করা যেতে পারে, সাধু যোসেফের যেসব প্রতীক রয়েছে প্রার্থনায় ও সাজানোর সময়ে সেসব উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে।

তিনি যেভাবে যিশু ও মারীয়ার সেবা করেছেন আমরাও যেন তেমনি সকল মানুষের সেবা করতে অনুপ্রাণিত ও তৎপর হই, সাধু যোসেফ যেন সেপথে চলতে আমাদের অনেক আশীর্বাদ নিয়ে দেন।

"শ্রমজীবীগণের আদর্শ" সাধু যোসেফের মাধ্যমে শ্রমিকদের জন্য বিশেষভাবে যারা কষ্টে আছে, বিপদে আছে, কঠিন অবস্থায় আছে তাদের জন্য প্রার্থনা করা যায় যেন বর্তমান কালে শ্রমিকগণও কাজের ভারে, কঠোরতায় সাধু যোসেফকে স্মরণ করতে পারে তাঁর কাছে যেতে পারে, তার কাছ থেকে শিখতে পারে কীভাবে কাজ হালকা, প্রেমময় ও আনন্দপূর্ণ হতে পারে আর কীভাবে তা অনন্ত সুখের পথ দেখাতে পারে।

আমরা প্রত্যেকে নীরব কর্মী সাধু যোসেফের আদর্শ ও জীবন অনুসরণ করে অন্তরে ভক্তি-বিশ্বাস নিয়ে যে যেখানে আছি সেখানেই আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় বেশী কাজ করি, ধৈর্য ধরে, কষ্ট ক'রে ভাল কাজ করি আর এভাবে পবিত্র ও ধর্মনিষ্ঠভাবে মহান সৃষ্টিকর্তার সহকর্মী হয়ে এ পৃথিবীকে সুন্দরতর, কল্যাণকর, অধিক বাসযোগ্য করে গড়ে তুলি। আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ পরিশ্রমে নিজেদের ভালবাসা প্রকাশ করি পৃথিবী ও সবার জন্য। আমাদের পিতা সাধু যোসেফ, সেজন্য আমাদের সবার জন্য অনেক প্রার্থনা করণন আর জীবনে-মরণে আমাদের ঈশ্বরের প্রচুর আশীর্বাদ নিয়ে দিন।

মণ্ডলীর প্রতিপালক : রক্ষক সাধু যোসেফ: আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর!

স্মৃতিতে অম্লান তোমরা

প্রয়াত মৌ গোমেজ

জন্ম : ২৮ ডিসেম্বর ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১২ জুন ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : মাটিভাঙ্গা, পটুয়াখালী (পাদ্রীশিবপুর)

১৪তম মৃত্যু বার্ষিকীতে তোমাকে মনে পড়ে, যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে

অতি আদরের মা মৌ,

দেখতে দেখতে ফিরে এলো সেই কষ্টেভরা বেদনার দিন ১২ জুন, যেদিন তুমি আমাদের সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে আশ্রয় নিলে পরম পিতার কাছে। দীর্ঘদিন রোগ যন্ত্রণা ও কষ্টভোগ করে গেলে। কি করে ভুলব তোমাকে? বিশ্বাস ও প্রার্থনা করি করুণাময় পিতা পরমেশ্বর যেন স্বর্গের অনন্ত সুখ, শান্তি দান করেন তোমার আত্মার কল্যাণে।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
মারীয়া গোমেজ (আন্টি)
বাবা : রমেশ গোমেজ
মা : কাকলী গোমেজ

প্রয়াত রবিন গোমেজ

জন্ম : ২১ জানুয়ারি ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ০৯ জুন ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : মাটিভাঙ্গা, পটুয়াখালী (পাদ্রীশিবপুর)

বাবা,

দেখতে দেখতে ২৬টি বছর কেটে গেল তুমি আমাদের ছেড়ে পরম পিতার কোলে স্থান করে নিয়েছ। আজও আমরা বেদনাবিধূর হৃদয়ে তোমাকে স্মরণ করছি বাবা। স্মৃতির মণিকোঠায় জমানো তোমার স্মৃতিগুলো প্রতিনিয়ত আমাদের কাঁদায়। তুমি যে আমাদের মাঝে নেই, এই নির্মম সত্যটি মেনে নিতে এখনো বড়ই কষ্ট হয় বাবা। প্রতিটি মুহূর্তে তোমার শূন্যতা অনুভব করি। তোমার স্মৃতি অম্লান হয়ে থাকবে সারা জীবন তোমার আদরের সন্তানদের হৃদয়ে। তোমাকে আমরা কোনদিন ভুলব না বাবা। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার আদর্শ, নম্রতা, ত্যাগ ও কর্মময় জীবন অনুসরণপূর্বক সকল কাজে পরিপূর্ণতা লাভ করি। সর্বশক্তিমান পিতা পরমেশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন তোমাকে স্বর্গের অনন্ত শান্তি দান করেন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
মারীয়া গোমেজ
ঢাকা

বিজ্ঞ / ১৫২/২১

পুণ্য উপাসনায় অর্থপূর্ণ শাস্ত্রবাণী পাঠে বাণী পাঠকের ভূমিকা

জুয়েল ডমিনিক কস্তা

ঈশ্বর তাঁর বাণীর মধ্য দিয়েকথা বলেন। আর পুণ্য উপাসনায় একটি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ অংশ হলো শাস্ত্রবাণী ঘোষণা বা শাস্ত্র বাণীর অনুষ্ঠান। সুতরাং যিনি এই বাণী পাঠ করবেন তাকে কত না প্রস্তুতি, কতই না মনোযোগী ও সজাগ-সতর্ক হয়ে পাঠ করতে হবে। কেননা এই পবিত্র বাণী আমরা শুধু নিজের জন্য পাঠ করি না; উপাসনায় যারা অংশগ্রহণ করে তাদের প্রত্যেকের জন্য পাঠ করি। খ্রিস্টভক্ত সকলে যেন শাস্ত্রবাণী স্পষ্ট, পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে, সেই লক্ষ্যেই একজন পাঠককে যথেষ্ট ভাবগাম্ভীর্য নিয়ে পাঠ করতে হয়। একইভাবে শাস্ত্রবাণী শ্রবণকারীকেও অনেক মনোযোগী হয়ে, যথেষ্ট ভক্তিভাব নিয়ে ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করতে হবে। আর এ প্রসঙ্গে আদি মণ্ডলীর মহাচার্য অরিজেন বলেন, " তোমরা যারা খ্রিস্টযাগের রহস্যে অংশগ্রহণ করতে অভ্যস্ত, তোমরা ভাল করেই জানো, কতই না ভক্তি তোমাদের দরকার, যাতে প্রভুর ভোজ গ্রহণ করার সময়ে পবিত্র রুটির টুকরো মাটিতে পড়ে না যায়। তোমাদের অবহেলার কারণে যদি তাই ঘটতো, তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই নিজেদের অপরাধী বলে মনে করতে। এখন, খ্রিস্টের দেহকে অবহেলা করার চেয়ে শাস্ত্র বাণীকে অবহেলা করা কি কোন মন্দ কাজ?

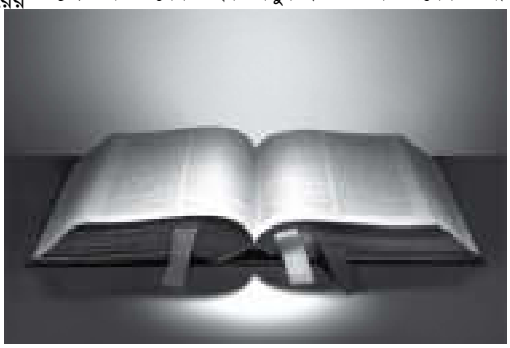

এই কথা দিয়ে অরিজেন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, শাস্ত্রবাণী শ্রবণকারী হিসাবে আমাদের অনেক যত্নের প্রয়োজন, শাস্ত্রবাণীর এতটুকু অংশ আমরা যেন বিনষ্ট না করি। কিন্তু আমরা এখানে দেখছি যে, অরিজেনের সতর্কবাণী মণ্ডলীর মাঝে বাইবেলের ঘোষণার দায়িত্বে যারা রয়েছেন তাদের জন্যও প্রযোজ্য। বাইবেলের পাঠক পাঠিকা ঈশ্বরের নিকট তার কণ্ঠ ধার দেয়, যেহেতু বাণী স্বয়ং ঈশ্বর। তাই বাণী পাঠকের পাঠ করা, বাণীর অর্থ বোঝানো, শ্রোতাদের কাছে শাস্ত্রবাণী বেশী বা কম বুঝবার জন্য সুযোগ দেয়। কেননা উপাসক মণ্ডলীর মাঝে শাস্ত্রবাণী ধ্বনিত হয় সেই পাঠকের সুর, বিশ্বাস, শক্তির মাধ্যমে এবং তার ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে। তাই পাঠকদের কাজ হালকা ভাবে দেখা উচিত নয়। ছেলে-মেয়েদের হাতে বা অপ্রস্তুত যেকোন ব্যক্তির হাতে ছেড়ে দেওয়ার কাজ নয় এটি।

প্রত্যেক খ্রিস্টিয় সমাজ যত্নসহকারে জনগণের মধ্যে থেকে কয়েক জনকে বেছে নেবে, যারা লোকদের সামনে কথা বলার গুণে গুণান্বিত। একজন পাঠক সঠিকভাবে তার ভূমিকা পালন করতে পারবেন যদি শাস্ত্র পাঠ পড়ার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি নেয়। অবশ্যই তিনি অর্থপূর্ণভাবে বাইবেল পাঠ করতে পারবেন যদি বাইবেল জানেন, বাইবেলকে ভালবাসেন এবং বাইবেলের সাহায্যে প্রার্থনা করতে অভ্যস্ত হন।

বাইবেল পাঠ করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ

১। সাধারণত গির্জায় বাণীমঞ্চ থেকে পাঠ করা হয়। এই স্থানটি হতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুন্দর একং আকর্ষণীয়। মাঝে মাঝে মঞ্চের সামনে সুন্দরভাবে লিখিত পাঠের প্রধান উক্তি টাঙানো যায়। কোন কোন সময় বাইবেল পাঠ করার আগে মঞ্চে দুইপাশে জ্বলন্ত বাতি নিয়ে দুইজন সেবক বা সেবিকা দাঁড়াতে পারে।

২। যেখানে পাঠক বাণীপাঠ করবেন সেখানে বাণীপাঠ করার জন্য যথেষ্ট আলোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। পাঠক এমন স্থানে দাঁড়াবেন যেখানে জনগণ তাকে সহজেই দেখতে পারেন।

৪। মাইকের ব্যবস্থা থাকলে তা থেকে পাঠককে কত দূরে থাকতে হবে তা পূর্বেই পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

শাস্ত্রবাণীর আদর্শ পাঠকের গুণাবলী

১। কণ্ঠস্বরের শ্রুতিমধুরতা : কণ্ঠস্বরের শ্রুতিমধুরতা হলো যে, কণ্ঠের উচ্চারণ বা পাঠ শুনতে ভাল শোনা যায়। যেখানে কোন জড়তা নেই, বাক্যের কোন অংশ কিভাবে উচ্চারণ করলে ভাল শুনা যাবে, অর্থাৎ যেখানে কোন কর্কশতা নেই, বা মিষ্টি ভাষী।

২। উচ্চারণের স্পষ্টতা : একজন পাঠককে বাণীপাঠ করার সময় বাক্য বা শব্দের স্পষ্ট উচ্চারণ করতে হয়। কেননা শব্দের স্পষ্ট উচ্চারণ জনগণকে বাণীপাঠ বুঝতে সহজ করে তোলে। কোন কোন সময় পাঠে জড়তা আসতে পারে, যা জনগণ ও পাঠকের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করতে পারে।

৩। সঠিক বাচনভঙ্গি : বাচনভঙ্গি হলো বাণীপাঠ করার সময় অঙ্গভঙ্গির ধরণ বা সঞ্চালন। সঠিক বাচনভঙ্গি জনগণকে বাণীপাঠ শ্রবণ করতে ও বুঝতে মনোযোগি করে তোলে।

৪। পঠন রীতি: পঠন রীতি হলো বাক্যের দাড়ি, কমা, কোলন, সেমিকোলন ইত্যাদি অনুসারে, প্রয়োজনে, ধীরে ধীরে বা জোরে পাঠ করা। এই পঠন রীতি অনুসারে বাণীপাঠ করলে সহজে খ্রিস্টভক্তগণ বাণীপাঠ বুঝতে পারেন।

৫। সার্বিক উপস্থাপনা : পাঠক যে বিষয়টি পাঠ করছে তা পাঠক নিজে বুঝবে এবং জনগণকে সে সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা দিবে।

বাইবেল পাঠ প্রস্তুতির জন্য কিছু পরামর্শ

ক. বাইবেল পাঠ করার আগে পাঠক নিজের স্থানে বসে মনে মনে এই ধরনের প্রার্থনা করবেন:

"হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমার কণ্ঠ ও আমার অন্তর তুমি পবিত্র করে তোল, আমি যেন যোগ্যভাবে তোমার মঙ্গলবাণী ঘোষণা করতে পারি।"

খ. প্রস্তুতি নেওয়ার সময়ে পাঠক চিহ্নিত করবেন কি কি শব্দ উচ্চারণ করতে তার অসুবিধা হয়। তিনি সেইসব শব্দগুলো যথাযথ ভাবে উচ্চারণের অনুশীলন করবেন।

গ. পাঠ করার আগে এবং পাঠ করার পরেও পাঠক ভক্তি সহকারে, নীরবে, কিছুক্ষণের জন্য বাইবেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

ঘ. বাইবেল পাঠ করার আগে পাঠক বাইবেলের সেই অংশের উপরে ধ্যান করতে চেষ্টা করবেন। এইভাবে পাঠ করার সময় পাঠক নিশ্চয় ভালভাবে জানতে পারবেন কোন কোন বাক্য বা শব্দের উপরে তাকে জোর দিতে হবে।

ঙ. পাঠ করার আগে পাঠক অপেক্ষা করবেন, যেন শ্রোতাদের মধ্যে শান্ত, নীরব ও মনোযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

চ. পাঠ করার সময় যদি হঠাৎ করে এদিক ওদিকে কোন অদ্ভুত শব্দ সৃষ্টি হয়, তাহলে পাঠক কিছুক্ষণের জন্য থামবেন যতক্ষণ পর্যন্ত সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে না আসে।

কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা *(১৩১-১৩৩)* অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, খ্রীস্টভক্তদের জীবন বাইবেল-বাণীর পাঠে পুষ্টি ও প্রাণশক্তি লাভ করে। তাতে খ্রিস্টভক্তেরা তাদের ধর্মবিশ্বাসের সমর্থন, তাদের আত্মার খাদ্য ও আধ্যাত্মিক জীবনের রচয়িতা যেমন বলেছেন : "তোমার বাণী যেন প্রদীপ হয়ে আমার পা ফেলার পথ দেখায়, তা যেন আমার পথের আলো" *(সাম ১১৯.১০৫)*। তাই খ্রিস্টমণ্ডলী সকল খ্রিস্টবিশ্বাসীকে বাইবেল-বাণী ঘন-ঘন পাঠ করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে- মহাচার্য জেরোম তো বলেছেন : "বাইবেল সম্বন্ধে অজ্ঞতা হল খ্রিস্টের সম্বন্ধে অজ্ঞতা"

পরিশেষে বলা যায় ঈশ্বরের বাণী হল অনন্ত-অসীম। আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে এই বাণী কোন না কোন ভাবে রেখাপাত করে যাচ্ছে। তাই বলা যায় সত্যিকার অর্থেই ঈশ্বরের বাণীর অনেক মূল্য রয়েছে। পবিত্র বাণীর আলোকে উদ্বুদ্ধ হয়েই আমরা আমাদের জীবনকে প্রতিনিয়ত পরিচালিত করছি, নিয়ন্ত্রিত করছি। সুতরাং, যারাই এই পবিত্র শাস্ত্রবাণী পাঠ করবে তারা যেন নিজেরাই প্রথমে এর মর্মার্থ বুঝতে পারে, অন্তরে ধারণ করে এবং যথাযথ ভক্তিভাব নিয়ে সকলের উদ্দেশে পাঠ করে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১। গারেল্লো সিলভানো সম্পাদিত : "খ্রীষ্টযাগ থেকে খ্রীষ্টমণ্ডলীস্ট পোপ দ্বিতীয় জন পল, অনুবাদ ফাদার আন্তনী সুখেন মণ্ডল, জাতীয় ধর্মীয় সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যশোর, ২০০৩।

২। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষার সংক্ষিপ্ত সার, খ্রিস্ট পূজন প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৮।

করব না অবহেলা করতে জপমালা

ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও

মা শব্দটি যেমন চিরন্তন সত্য তেমনি জীবনে মায়ের গুরত্ব, সম্মান, ভক্তিপূর্ণ বিশ্বাসও চিরন্তন। সংসারে প্রত্যেকেজন মায়ের গুরুত্ব সর্বাধিক। মারীয়া জগতের মানুষ হলেও পুত্রঈশ্বর ত্রাতার মাতা হয়ে আমাদের সাহায্যকারিণী ও সর্বকালের রক্ষাকারিণী মা হলেন। মা মারীয়ার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসার স্তব নিবেদন যুগ যুগ ধরেই বিভিন্ন ভাবে প্রচলন রয়েছে। মা মারীয়া ছিলেন পবিত্রা, পিতা ঈশ্বরের বাধ্য, প্রার্থনাশীলা, নম্র, বিচক্ষণ, ধৈর্যশীলা এবং ঈশ্বরের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস। মায়ের নাম পুন: পুন: জপ করে ভক্তি বৃদ্ধি, সান্ত্বনা, বিশ্বাস ও মুক্তিলাভ করা চিরন্তন সত্য। ঈশ্বরের মানব মুক্তি পরিকল্পনাকে যে নারী শুধুমাত্র একটি বার 'হ্যাঁ' ইতিবাচক সম্মতির বদলে 'না' বলে পণ্ড করে দিতে পারতেন তিনিই কুমারী মারীয়া, ঈশ্বরপুত্র যিশুর মাতা, তিনি আমাদেরও মা। দিব্য জগতে তাঁর ক্ষমতা অসীম। তাই আমাদের সকলের মা, ক্ষমতা ও কৃপাময়ী মুক্তিদাত্রী কুমারী মারীয়াকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক আমরা যে মালার প্রার্থনা করি সেটাই হচ্ছে রোজারি মালা, জপমালা বা মায়ের মালা।

অক্টোবর মাস হল জপমালার মাস। এ মাসে আমরা মায়ের কাছে বিশেষ ভক্তিভরে জপমালা প্রার্থনা করি। জপমালার রাণী মারীয়া হলেন জীবনদাতা, মুক্তিদাতা, শান্তিদাতা প্রভুর মা। মানুষের পরিত্রাতা যিশু খ্রিস্টের জননী হওয়ার মধ্য দিয়ে ধন্যা কুমারী হয়ে উঠলেন সমগ্র মানব জাতির জননী। প্রায় ৫ম শতাব্দী থেকে মাতা মণ্ডলীতে খ্রিস্টভক্তগণ মায়ের প্রতি ভক্তি প্রকাশের জন্য জপমালা প্রার্থনা করে আসছেন। জপমালা প্রার্থনা সর্ম্পকে বলতে গিয়ে মা মারীয়ার দর্শনপ্রাপ্তা সিস্টার লুসি বলেছেন যে, "ঈশ্বর মাতা মারীয়ার জপমালা এমনি একটি মহাশক্তি দান করেছে যার দরুন জগতে এমন কোন দুরূহ সমস্যা নেই যা কিনা এই প্রার্থনার বলে সমাধান হতে পারে না"। মহামান্য পোপ ৫ম পল বলেছেন, "জপমালা প্রার্থনা হচ্ছে কৃপার ধন ভাণ্ডার"।

সাধু পোপ ২য় জন পল তাঁর 'কুমারী মারীয়ার জপমালা' নামক প্রৈরিতিক পত্রে বলেন, 'পবিত্র জপমালা প্রার্থনা তার প্রাচীন ঐতিহ্যের মাধ্যমে নিজেকে এমন একটি কার্যকর প্রার্থনা হিসাবে উপস্থাপন করেছে, যা পরিবারকে এক করে তোলে। পরিবারের স্বতন্ত্র সদস্যগণও যিশুর দিকে তাদের চোখ ফিরিয়ে, পুনরায় ফিরে পায় পরস্পরের চোখে চোখ রেখে একে অপরকে দেখা, পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করা, একাত্মতা প্রকাশ করা ও একে অপরকে ক্ষমা করার এবং ঐশ আত্মায় নবায়িত তাদের ভালবাসার সন্ধিকে দেখার ক্ষমতা"। আমরা সন্তান হিসেবে যেমন আমাদের মাকে মধ্যস্থতা করে বাবার কাছে আমাদের প্রয়োজনের কথা বলি, তেমনি মা মারীয়া হলেন মধ্যস্থতাকারী। আমরা তাঁর কাছে আমাদের প্রয়োজন জানালে, তিনি প্রভু যিশুর কাছে তা তুলে ধরেন এবং যিশু আমাদের সে প্রয়োজন মিটিয়ে দেন।

জপমালা প্রার্থনা একটি ধ্যানমূলক প্রার্থনা, আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ একটি প্রার্থনা। প্রভু যিশুকে কেন্দ্র করে যে মঙ্গলসমাচার, সেই মঙ্গলসমাচার হল জপমালা প্রার্থনার আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি। খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতায় গঠিত এই জপমালা। কেননা মা মারীয়ার মধ্যস্ততায় আমরা যিশুর জীবন নিয়ে ধ্যান-প্রার্থনা করি। আমাদের প্রার্থনার জীবনে আধ্যাত্মিকতা একদিনে গড়ে ওঠে না। এর জন্য অনেক সাধনা প্রয়োজন। জীবনের যাত্রা পথে জপামালা প্রার্থনা পুষ্টিদান করে। প্রয়াত সাধু পোপ দ্বিতীয় জন পল জপমালার প্রার্থনার আধ্যাত্মিকতা সমন্ধে বলেছিলেন, "রোজারিমালা জপ করার সময় খ্রিস্টভক্তগণ মা মারীয়ার চরণে বসে তাঁরই সঙ্গে খ্রিস্টের শ্রীমুখের সৌন্দর্য অবলোকন করে, খ্রিস্টের অসীম ভালবাসার গভীরতা উপলব্ধি করে। রোজারি মালা জপ করতে করতে তারা যেন মুক্তিদাতার জননীর হাত থেকেই শত শত আশীর্বাদ লাভ করতে থাকে"।

জপমালা প্রার্থনা যদিও উপাসনা (Liturgy) প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত নয়, তবুও এই প্রার্থনাকে খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের "প্রাহরিক প্রার্থনা" বা ধন্যা মারীয়ার "সামসঙ্গীত" বলা হয়। বস্তুত জপমালার সকল প্রার্থনাই উপাসনার অংশ বিশেষ, যেমন- 'প্রভুর প্রার্থনা', 'ত্রিত্বের জয়', 'প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র'। একটি প্রার্থনা পদ্ধতি হিসাবে জপমালা প্রার্থনা উপাসনা প্রার্থনার দিকে আমাদের চালিত করতে এবং গভীরভাবে প্রার্থনার জীবনে প্রবেশ করতে নিশ্চিতভাবে অনেক সাহায্য করে থাকে। জপমালা প্রার্থনা মা-মারীয়া কেন্দ্রিক হলেও, মূলত এটা হল খ্রিস্ট কেন্দ্রিক প্রার্থনা। এই প্রার্থনায় রয়েছে পূর্ণভাবে মঙ্গলসমাচারের গভীর বার্তা। তাই জপমালা প্রার্থনা বলা যেতে পারে মঙ্গলসমাচারের সার সংক্ষেপ। জপমালা প্রার্থনা সম্পর্কে কার্ডিনাল নিউম্যান বলেছিলেন, "জপমালা প্রার্থনার চেয়ে পরম আনন্দদায়ক বিষয় আর নেই"। সাধু পোপ ত্রোয়োদশ লিও বলেছিলেন, 'যে সমস্ত মন্দতা সমাজকে আক্রান্ত করে তা প্রতিহত করার জন্যে জপমালা প্রার্থনা হল একটি কার্যকর উপায়"। সাধু পোপ দ্বিতীয় জন পল বলেছিলেন, "জপমালা আমার প্রিয় প্রার্থনা, এক বিস্ময়কর প্রার্থনা। বিস্ময়কর এর সরলতায় এবং এর গভীরতায়"।

সত্যিই, জপমালা হল সহজ, সরল এবং মা মারীয়ার প্রতি গভীর বিশ্বাসের প্রার্থনা। কারণ জপমালা শুধু একটি মৌখিক প্রার্থনা নয়, এটি আমাদের হৃদয়ের প্রার্থনা। জপমালা প্রার্থনায়, 'প্রণাম মারীয়া' বলতে বলতে আমরা মনে মনে যিশুর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা বা রহস্য বা নিগুঢ়তত্ত্বগুলো ধ্যান করি, যা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে কুমারী মারীয়ার সাথে। জপমালা প্রার্থনার নিগূঢ়তত্ত্বগুলো ধ্যান করার মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। জপমালা প্রার্থনার নিগুঢ়তত্ত্বগুলো গোটা মঙ্গলসমাচারকেই প্রকাশ করে তার শিক্ষা ও খ্রিস্টীয় মূল্যবোধকে আমাদের দান করে। এ প্রসঙ্গে পোপ ৬ষ্ঠ পল বলেছেন, "সমগ্র মঙ্গলসমাচাররের সংক্ষিপ্ত সার হলো এই রোজারি মালা। আমাদের ইচ্ছা ভক্তগণ যেন এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে মা মারীয়াকে অনুনয় করে। এই প্রার্থনা শুধু মন্দতাকেই পরাভূত করে না বরং খ্রিস্টীয় জীবনও প্রাণবন্ত করে তোলে"।

জপমালা প্রার্থনা হলো একটি শান্তির প্রার্থনা। পোপ দ্বিতীয় জন বলেছেন, "শান্তির জন্য একটি প্রার্থনা হিসেবে, জপমালা প্রার্থনা সবসময়ই ছিল পরিবারের প্রার্থনা ও পরিবারের জন্যই প্রার্থনা। যে পরিবার এক সঙ্গে প্রার্থনা করে সে পরিবার এক সঙ্গেই টিকে থাকে। পবিত্র জপমালা প্রার্থনা তার প্রাচীন ঐত্যিহ্যের মাধ্যমে নিজেকে একটি কার্যকর প্রার্থনা হিসেবে উপস্থাপন করেছে, যা পরিবারকে এক করে তোলে। বর্তমান বিশ্বের এই অশান্তময় অবস্থা থেকে মা মারীয়া আমাদের সাহায্য করেন পরিত্রান পেতে যদি আমরা ভক্তিভরে প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা করি। আধ্যাত্মিক জীবনে জপমালা প্রার্থনার মাধ্যমে মায়ের সাথে থেকে আমরা তাঁকে অনুসরণ করে থাকি। বলার অপেক্ষা রাখে না, জপমালা প্রার্থনা আমাদের অন্যতম পছন্দের একটি প্রার্থনা এবং বহুল ব্যবহৃত একটি অসাধারণ প্রার্থনা। যিশু নাম জপের মত জপমালা প্রার্থনা জপ করতে করতে আমরা নিজেদের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করি। জীবনের সমস্থ প্রতিকূলত অবস্থার মধ্যে খ্রিস্টের বিশ্বাস অটুট থাকে। জপমালা প্রার্থনা আমাদের নিয়ে যায় মা মারীয়ার কাছে, মা মারীয়া আমাদের নিয়ে যায় যিশুর কাছে, যিশু আমাদের নিয়ে পিতা ঈশ্বরের কাছে। এইভাবে জপমালা প্রার্থনায় ধন্যা কুমারী মারীয়ার সহযোগিতায় যিশুর জীবনে নিয়ে ধ্যান প্রার্থনা করতে করতে আমরা খ্রিস্টের আধ্যাত্মিকতায় প্রবেশ করি।

পারস্পরিক সম্পর্কের জীবন

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

মানব জীবনে সম্পর্ক ব্যাপারটা খুবই সুন্দর এবং একই সঙ্গে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ মানুষের সাথে নানাবিধ সম্পর্কে জড়াবে; এটাই মানুষের বৈশিষ্ট্য। সেই সম্পর্কের জীবনে যেমন থাকবে উত্থান পতন। তেমনি ভাঙ্গা-গড়া। জীবনে বেঁচে থাকতে হলে নিশ্বাস নেওয়া যেমন জরুরী তেমনি সুন্দর একটি সম্পর্কে বাস করাও অত্যন্ত জরুরী। জীবন আর কিছুই নয়, সম্পর্কের সমাহার। আমাদের জীবন সম্পর্কের ঘনঘটায় ক্রমাগত রূপান্তর হতে থাকে। এ রূপান্তরের শেষ অঙ্কে কেউ আমরা সম্পর্কের টানে ফিরে আসি; আবার কেউ সম্পর্কের মায়া ছিন্ন করি। তাই বলা যায়, সম্পর্ক হচ্ছে জীবন বাতির সলতে। যে পরিচর্যা করে তারটা ভালো ভাবে জ্বলতে থাকে। আর যে যত্ন করে না, তারটা নিভু নিভু করতে করতে ঝাপসা হয়ে যায়।

বর্তমান সময়ের জাগতিকতায় আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ অনেকাংশে কমে যাচ্ছে। নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ছুড়ে ফেলে দেয়ার সংস্কৃতি তৈরি হচ্ছে। তাই বর্তমান বাস্তবতায় পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস সর্বজনীন পত্র লিখেছেন। 'ফ্রাতেল্লি তুত্তি' অর্থাৎ 'আমরা সবাই ভাইবোন'। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস মানুষ, সমাজ ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করে তাঁর সার্বজনীন পত্রে, মঙ্গলসমাচারের আলোকে জীবন পদ্ধতি বেছে নেয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। আমরা সবাই সামাজিক জীব। প্রকৃতিগত ভাবেই একে অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আমরা ঈশ্বর ও ভাই মানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকতেই সৃষ্টি হয়েছি। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস খুবই সুন্দরভাবে তাঁর পত্রে ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সুসম্পর্কের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তিনি আরও বলেছেন, আমাদের প্রতি নিমন্ত্রণ- সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা। কেননা আমরা পরস্পরের সাথে এবং সৃষ্টির সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত।

আভিধানিক অর্থে সম্পর্ক এক বা একাধিক মানুষের সাথে একটি ক্রিয়াশীল অনুভূতির নাম। যার প্রকাশ একইভাবে হতে হবে সেটি নয়। সম্পর্ককে আমরা সামাজিকীকরণ করে থাকলেও এর অবস্থান আত্মিক। প্রথাগতভাবে সম্পর্ককে আমরা নামকরণ করে থাকি রক্তের সম্পর্ক। আত্মীয়তার সম্পর্ক। বন্ধুত্বের সম্পর্ক। প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক। মানুষের সম্পর্ক যেহেতু অনুভব থেকে; তাই সে অনুভবকে নির্দিষ্ট ফ্রেমে বজায় রাখা সহজ নয়। কেননা মানুষের রক্তের সম্পর্কও টিকে থাকে না। এমনকি সব সময় রক্তের সম্পর্ক সম্পর্ককে সংজ্ঞায়িত করে না। তাই আপন পর হয়ে যায়। আবার পর আপন হয়ে ওঠে। আসলে সম্পর্ক ভারি রহস্যঘেরা বিষয়। বলা হয়, সম্পর্ক একটি প্রশান্ত ছায়া। একটি অনুভব। সম্পর্ক এমন একটি বিষয় যা পরিচর্যা ছাড়া বেঁচে থাকে না। অর্থাৎ সম্পর্কের মৃত্যু হতে পারে। সম্পর্ক একটি চারাগাছের মতো। তার নার্সারির দরকার হয়। প্রয়োজন পড়ে ঠিকমতো আলো, বাতাস ও পানির। অর্থাৎ পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ, যোগাযোগ, যাওয়া-আসার, সংলাপের।

সম্পর্ক অনেক ধরনের হতে পারে। শারীরিক, আধ্যাত্মিক, মানবীয়। তাই তো কিছু সম্পর্ক মানুষ ধারণ করে। কিছু সম্পর্ক জীবন চলার

পথে গড়ে ওঠে। কেননা জীবনে বন্ধুত্বহীনতা অসহনীয়। তাই সবাই বন্ধু খুঁজে। খুঁজে পেলে সম্পর্ক করে কিংবা বন্ধুত্ব হয়ে যায়। আবার সেই সম্পর্ক বেড়ে উঠতে সময় দিতে হয়। বন্ধুত্বে স্বেচ্ছা আনুগত্য থাকে। মানব জীবনে প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। নারী-পুরুষের ভালোবাসার প্রবণতা কেবল বন্ধুত্বের নয়। যদিও বন্ধুত্ব এ সম্পর্কের ভিত্তি প্রস্তর। নারী-পুরুষের এ সম্পর্ক যেমন আত্মিক, তেমনি শারীরিক। আসলে সম্পর্ক এক গভীর দায়িত্ববোধ। কিছু কিছু সম্পর্ক হয় ক্ষণিকের দেখায় কিন্তু স্থায়ীত্ব অজীবনের। কিছু কিছু সম্পর্ক হয় রক্তের আর কিছু সম্পর্ক হয় আত্মার। যেমন, সৃষ্টিকর্তার সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক। ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ। যা থাকে হৃদয়ের গভীরে। দেখা কিংবা স্পর্শের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বেঁচে থাকে আজীবন। এ এক বিস্ময়! অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "আনন্দের চেয়ে দুঃখের বন্ধন দৃঢ়তর।"

মানুষ প্রতিনিয়ত নানা সম্পর্কের মায়াজালে আবদ্ধ হয়। সম্পর্ক মূলত দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে আবেগ, ভালোবাসার মাধ্যমে মানসিকভাবে যুক্ত করে। সম্পর্কের মাঝে ভালোবাসা আসলে আমাদের যোগ্যতা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী করে। সম্পর্ক শুধু অন্যের কাছে প্রাধান্য পাওয়া নয়; বরং যে কোনো প্রয়োজনে পাশে পাওয়ার নিশ্চয়তা। সম্পর্ক আমাদের মনে এক গভীর নিরাপত্তাবোধ দেয়। উদ্বেগ কমায়। আমাদের আনন্দিত করে। জীবনের ছোট-বড় নানা সমস্যা মোকাবেলা সহজ করে। পরস্পরের প্রতি সম্পর্ক ব্যক্তিকে উজ্জীবিত ও জীবনমুখী করে। কর্মস্পৃহা বাড়ায়। পজিটিভ সাইকোলজির প্রবক্তা মার্টিন সেলিগম্যান ব্যক্তির ভালো থাকা বা সুখের যে পাঁচটি স্তম্ভের কথা বলেছেন, তার মধ্যে 'সম্পর্ক' অন্যতম। গুণগত জীবন যাপনের জন্য ইতিবাচক সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ। এমন কি ইতিবাচক সম্পর্ক সুখের অন্যতম প্রধান নির্ধারক। আবার সম্পর্ক সব সময় যে এক রকম থাকবে তেমন কোন ভিত্তি নেই। তাই হাতের নখ বড়ো হলে যেমন নখ কাটতে হয়, আঙ্গুল না! তেমনি সম্পর্কের মাঝে ভুল হলে ভুল ভাঙতে হয়, সম্পর্ক নয়। সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে পরিশ্রম করতে হয়।

একটি সম্পর্ক মূল্যবোধ, দায়বদ্ধতা, বন্ধন, বিশ্বাস, সম্মান ও যত্নের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস থাকতে হয়। একবার ভাবুন তো, কত মানুষ আমাদের চারপাশে। তার কেউ চেনা, কেউ-বা অচেনা। জন্ম আর জীবনের কোলাহলে ঘরে-বাইরে নানাভাবে মানুষ মানুষের সাথে সম্পর্কে জড়ায়। অর্থাৎ একে অপরের পরিচিলিত হয়ে ওঠে। চেনাজানার গণ্ডী পেরিয়ে এক সময় জগতের অচেনাজনই আবার হয়ে ওঠে যেন আত্মার আত্মীয়। আবার বহুদিনের চেনাজানারাই কখনও-বা জীবনের কষাঘাতে হয়ে যায় অচেনা মানুষ। তাই তো মানব জীবন চেনা-অচেনা মানুষের ভীড়ে এগিয়ে চলে ধীরে ধীরে। চলার পথে এমন কারো কারো দেখা মেলে। যাদের সাথে আলাপের এক সময়ে তাদের জীবনের সবচেয়ে মায়াময়, সর্বাধিক বেদনার স্মৃতি পর্যন্ত সহভাগিতা করতে কুণ্ঠিত হয় না। অথচ কী আশ্চর্য! হয়তো আজকের সকালেও যে ছিল অচেনা, অপরিচিত। দেখা হওয়া তো দূরে থাক। কিন্তু সেই কি-না দিন শেষে চিরচেনা কিংবা তার বলা কথাগুলো ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় বা চিন্তায় ফেলে। অন্যদিকে মানুষের জীবন গল্পের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। জীবন আর গল্প একজন আরেকজনের কাঁধে ভর করে এগিয়ে চলে। আমরা সবাই সম্পর্কে একজন অরেকজনের সাথে জড়িয়ে আছি। কেননা একা একা কোন সম্পর্ক তৈরি করে না। সম্পর্ক আমাদের জীবনে কখনো বৃক্ষের মতো ছায়া দেয়। বেঁচে থাকার রসদ যুগায়। কখনো প্রতিকূল অবস্থায় রক্ষা করে। কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পর্ক আবার লতার মতো। জীবনকে আঁকড়ে ধরে জড়িয়ে থাকে।

তথ্যসূত্র :

1. http://www.vatican/content/
2. francesco/enciclica-fratelli-tutti
3. https://samakal.com/tp-kaler-kheya
4. https://www.prothomalo.com

অপরাধ দমনে চাই সম্মিলিত উদ্যোগ

ড. আলো ডি'রোজারিও

অপরাধ দমন জাতীয় সমৃদ্ধির ও উন্নতির অন্যতম সহায়ক। জনগণের সন্তুষ্টি ও সমাজের শান্তির গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক। পর্যটক খাতের বিকাশ, দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে আস্থা বাড়াতে কার্যকর অপরাধ দমন ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। অপরাধ দমনে নিয়োজিত আমাদের দেশের বিভিন্ন সংস্থার সক্ষমতা ও আন্তরিকতা বেড়েছে। বেড়েছে রাজনৈতিক সৎ ইচ্ছাও। আমরা তাই দেখছি অপরাধ করে বেশীরভাগই আর ছাড় পাচ্ছেন না। অপরাধীর পরিচয় এখন আগের মতোন আর বিবেচ্য বিষয় না। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় হতে আসছে অপরাধ দমনের নিরন্তর সুস্পষ্ট নির্দেশনা।

সংবাদমাধ্যমে অপরাধ দমন বিষয়ে চলছে বিস্তর আলোচনা ও লেখালেখি । উদ্দেশ্য: অপরাধের ধরন ও কারণ বিশ্লেষণ, অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের কার্যকর ব্যবস্থার সুপারিশ, সেসাথে অপরাধ দমনে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি। আলোচনা ও লেখা থেকে স্পষ্ট, স্থান ও কালভেদে অপরাধের ধরন পাল্টায়। আমাদের দেশে ছিনতাই, খুন, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ, নারী ও শিশু নির্যাতন বিভিন্ন সময়ে বেড়েছে। ক্ষমতাহীনতার কারণে নারী, শিশু, বিত্তহীন ও সংখ্যালঘুরা হয়েছেন অধিক সংখ্যায় অপরাধের শিকার।

বিভিন্ন লেখা থেকে জানা যায়, কিছু ব্যক্তি ক্ষমতার দাপট দেখাতে ও লোভের বশে অপরাধ ঘটান। কেউ কেউ অপরাধী হন সুশিক্ষা ও সুস্থ মানসিক গঠনের অভাবে। প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় নানা কারণে কম সংখ্যক অপরাধী সাজা পেয়েছেন। সময়সাপেক্ষ, জটিল ও ব্যয়বহুল বিধায় অপরাধে ক্ষতিগ্রস্থদের কেউ কেউ আইনের প্রতিকার পেতে আগ্রহী না। লোকলজ্জায় ও অপরাধীর হুমকির ভয়েও অনেকে প্রতিকারের আশা ছেড়ে দেন।

গবেষণা ও সংবাদমাধ্যম থেকে জানা যায়, কঠোর আইন ও এর যথাযথ প্রয়োগ অপরাধ দমনে সাময়িক সুফল আনে। সুদূরপ্রসারী সুফল আনতে প্রয়োজন শিশুর সুশিক্ষা এবং তাদের সুস্থ মানসিক গঠন। বিশ্বের কোন কোন দেশে আইনের কঠোর প্রয়োগেও অপরাধের মাত্রা কাংখিত হারে কমানো সম্ভব হয় নি। অপরাধ বরং বেড়েছে। তাই আইন প্রয়োগে অপরাধ প্রতিকারের পাশাপাশি সেসব দেশে স্কুল-কলেজে শিক্ষাবিষয়ে যোগ হয়েছে অপরাধ সম্পর্কে ধারণা ও প্রতিরোধের কৌশল। অপরাধ প্রতিরোধে সম্পৃক্ত করা হয়েছে পিতামাতা, অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে। শিশুর সুস্থ মানসিক গঠনে দেয়া হচ্ছে বাড়তি মনোযোগ।

আমাদের অতীত সমাজব্যবস্থায় পরিবার শিশুর সুস্থ মানসিক গঠনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিল। সমাজ যত্নশীল ছিল অপরাধ দমনে। পরিবারে স্নেহ ছিল, শাসনও ছিল। ছোটদের জন্য বড়দের এখনকার চেয়ে বেশী সময় ছিল। গল্পে গল্পে ছিল নীতিশিক্ষা। আর আজ? সময় নেই সময় দেবার। কাছে তেমন কেউ থাকেন না শিশুদের কথা শোনার। কী শহর কী গ্রাম সর্বত্রই অবস্থা অভিন্ন।

শৈশবে আমি আমার বাবামা ও পরিবারের বড়দের কাছে যতটা সময় পেয়েছি ততটা আমরা আমাদের সন্তানদের শৈশবে দিতে পারি নি। সময় না পেতে পেতে এখনকার শিশুরা বাবামা'র কাছে সময় চায় না। তারা চায় অন্যকিছু! 'পারিবারিক মূল্যবোধ' বিষয়ের সেমিনারে ১০ বছর আগে ঢাকা শহরের কিশোরকিশোরীদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম- তোমরা বাবামায়ের কাছ থেকে কি পেলে সবচেয়ে বেশী খুশী হও? উত্তরে শীর্ষে ছিল- 'সময়'। তখন শতকরা ৭০ ভাগ অংশগ্রহণকারী বলেছিলেন- বাবামা সময় দিলে আমরা অনেক বেশী খুশী হই। গতবছর একই প্রশ্নের উত্তরে ৮২ ভাগ কিশোরকিশোরী বললেন- আমরা স্মার্টফোন পেলে খুব খুশী হই। সবার অজান্তে স্মার্টফোন পেছনে ঠেলে দিল বাবামা'র সাথে সময় কাটানোর আনন্দকে। এই ধারা চলতে দিলে আমাদের ভবিষৎ যে আরো অন্ধকার হবে। আমরা কেউ অন্ধকার ভবিষৎ চাই না। তাই শিশুদের আরো বেশী সময় দিবো। বয়সে বড় ও আপনজনদের কাছ থেকে সময় পাওয়াটা শিশুদের অধিকার। তাদের এই সময় পাবার অধিকার পূরণে আমরা বড়রা আরো আন্তরিক হবো। এই অনুরোধ রাখতেই পারি। বিশ্বের অনেক দেশে শিশুদের হাতে স্মার্টফোন দেবার নিয়ম নেই। আমরা দিচ্ছি। তবে সকলে না। বিশ্বে সেরা ধনীদের একজন বিল গেইটস তার সন্তানদের সাধারণ মুঠোফোন ব্যবহার করতে দিয়েছেন নিয়ম করে। দিনে দু'এক ঘন্টার জন্যে। ইংল্যান্ডে স্কুলের শিশুরা টেলিভিশন দেখে নিয়ম মেনে, নির্দিষ্ট চ্যানেলে, নির্দিষ্ট সময়ে ও অভিভাবকগণের তত্ত্বাবধানে। তারা নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমুতে যায় । ঘুমুতে গেলে পরিবারের বড় কেউ মূল্যবোধের গল্প ও মহান ব্যক্তির জীবনী পড়ে শোনান। কি কি পড়তে হবে স্কুল হতে সে নির্দেশনা থাকে। ইংল্যান্ডে আমার চার বছরের পড়াকালীন সময়ে দেখেছি কীভাবে স্কুলের শিক্ষকগণ ও বাসার অভিভাবকগণ একযোগে কাজ করেন শিশুর সুষ্ঠু মানসিক বিকাশের জন্যে। আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্যে শিক্ষণীয় গল্প শুনিয়ে শিশুদের ঘুম পাড়ানো হতো। এটা ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের বাবা-মা ও অভিভাবকদের আরো বেশী খেয়াল রাখতে হবে শিশুদের টেলিভিশন দেখার ব্যাপারে। মনে রাখতে হবে, শিশুদের দিনে তিন ঘন্টার বেশী টেলিভিশন দেখতে দিতে নেই কারণ তাতে শিশুদের বুদ্ধির বিকাশ ব্যাহত হয়, কমে যায় সৃজনশীলতা। মুঠোফোন ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও সময় সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে। দিনে একবার কী দু'বার, আধঘন্টা করে। মহামারীকালে স্কুল-কলেজের অনলাইন ক্লাশের সময় তো দিতেই হবে।

আমি তখন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। আমাদের এলাকায় সেবার গ্রামভিত্তিক ফুটবল খেলাশেষে মারপিটে প্রতিপক্ষের পাথরের ঢিলে একজন মারা গেলেন। সামাজিক বিচারে আশেপাশের গ্রামের অনেক মাতব্বর বিচারকাজে অংশ নিলেন। বিচারের রায়ে সাজা পেলেন অপরাধী, তার দল, পরিবার এবং গ্রাম। সাজা হিসেবে ছিল; অপরাধীর ক্ষমা প্রার্থনা, পরিবারের অঙ্গিকারনামা, দল ও গ্রামের আর্থিক দন্ড, সামাজিক দায়িত্বপালন। সামাজিক দায়িত্বপালনের মধ্যে অন্যতম ছিল পরবর্তী তিন খেলার শৃংখলা রক্ষা, যা করতে হয়েছিল আপরাধীর গ্রামকে। সেই সামাজিক বিচারের সুদূরপ্রসারী ফল হিসেবে আজোবধি অনুরূপ অপরাধ এলাকায় আর ঘটেনি। আমাদের সমাজে অপরাধ দমনে অলিখিত নিয়ম ছিল। সেই নিয়ম ভঙ্গে ছিল কঠোর ও শিক্ষণীয় শাস্তি। বেশীরভাগ অপরাধের বিচার তখন যৌথ পরিবারে বা গ্রাম সমাজে সম্পন্ন হতো। সামাজিক নিয়মনীতি ছিল। সকলে নিয়ম রক্ষায় যত্নবান ছিলেন। ফলে সমাজ ছিল সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃংখল।

অপরাধ দমনে আমাদের সমাজের অতীত অভিজ্ঞতার ভালোদিকগুলো আমাদের জানা দরকার। অন্যান্য দেশের সফল উদ্যোগ থেকেও আমরা জানতে পারি অপরাধ দমনের অনেক কার্যকর কৌশল। যেসব দেশ অপরাধ দমনে অপেক্ষাকৃত বেশী সফল সেসব দেশের সাফল্যের পেছনে রয়েছে অপরাধ দমনে সম্মিলিত উদ্যোগ। আশার কথা, আমাদের দেশে অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে সম্মিলিত উদ্যোগে আগ্রহ, আন্তরিকতা ও অংশগ্রহণ বাড়ছে। তাতে সামিল হচ্ছে পরিবার, সমাজ, গবেষক, উন্নয়নবিদ, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাজনীতিবিদ ও সরকারের একাধিক প্রতিষ্ঠান ও বিভাগ। জাতির উত্তরোত্তর মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অপরাধ দমনের এই সম্মিলিত উদ্যোগ আরো বেগবান হোক, এটাই প্রত্যাশা।

সত্যি এমন যদি ভালোবাসা হতো

শৈবাল এস গমেজ

কই রে বাবা সৃজু, কোথায় পালালীরে?
টুও!
আমি কিন্তু এবার রেগে যাবো, স্কুলে যেতে হবে তো। এখনো সকালের নাস্তা খেলোনা, তারাতারি বেরিয়ে এসো।
সৃজু, হেরী ও দোলনের সবচেয়ে আদরের সন্তান। ওর পুরো নাম সৃজন টমাস গমেজ। মা আদর করে সৃজু ডাকে। সৃজুর বয়স মাএ ৪ বছর। ছেলে হিসেবে ছোট খাটো খুব মিষ্টি দুষ্টুমী করেই থাকে। মাও তাকে দুষ্টমীর সুযোগ দেয়, কখনও কষ্ট দেয় না । কোন ভুল করলে তার উপর না রাগ করে বিষয়টি ভাল ভাবে বুঝিয়ে দেয়। এটা করলে কি হবে, ওটা করলে কি হবে, মন্দ কাজ করলে কার কেমন ক্ষতি হবে, এই সবই ওকে বুঝিয়ে দেয়। এই অল্প বয়সে সৃজু কতটুকু বুঝে তা বলা যায় না , তবে মার মন জয় করার জন্য যে,মার বাধ্য থাকতে হবে তা ওকে আর বলে দিতে হয় না। তা ওর চাল-চলনে বুঝা যায়। বাবা খুব সকালে ওর ঘুম থেকে উঠার আগেই তার কর্মস্থলে চলে যায়।তবে ছুটির দিন গুলিতে বাবা-ছেলের চিত্ত-বিনোদনের অভাব হয় না। বাবা কখনো হয় ঘোড়া, কখনোবা চোর কিংবা ডাকাত, কখনোবা একটু কাছেই দূরে ঘুরতে যাওয়া দুজনে মিলে। এভাবেই চলে বাপ ছেলের দিন। মা ও বাবার ভালোবাসায় সৃজু আস্তে আস্তে এ ভাবেই বড় হতে থাকে।
সৃজু এখন ক্লাস টেন-এ পড়ে, প্রতিদিনই সে তার বন্ধুদের সাথে স্কুলে যায়। তবে সৃজু ছিল একটু সহজ সরল। যে যাই বলতো খুব সহজেই তা বিশ্বাস করতো। তবে বন্ধুদের পাল্লায় পরে কখনো স্কুল কামাই দেয় নি বা কোন বড় ধরনের অন্যায় করেনি। জয়েস হলো ওর সহপাঠী। জয়েসের প্রতি ওর মনে কেমন জানি একটু দুর্বলতা ছিলো। জয়েস যদি সৃজুকে "হায়" বলতো তাহলে সৃজুর কেমন যে লাগতো তা বলে প্রকাশ করা যায় না। একবার এক স্কুলের অনুষ্ঠানে কি কারণে জানি জয়েস ওর আরেক বান্ধুবীকে খুঁজতে ছিল, হঠাৎ করে, সৃজুর সাথে দেখা, তাই ওকে বলল-
সৃজন, কেমন আছ? (একটু লাজুক সরে)
সৃজু কিযে বলবে বুঝতে পারছেনা, হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তাই জয়েস আবার জিজ্ঞেস করলো-
কি হলো কিছু বলছো না যে?
না.....! কিছু না , এই তো ভালোই। আর তুমি?
আমি ভালোই আছি। আচ্ছা, তুমি কি আমায় একটু সাহায্য করতে পার?
কি ভাবে আমি তোমায় সাহায্য করতে পারি বলো।
না মানে আমার বান্ধুবী জেসীকে খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি কি একটু ওকে খুঁজে বের করতে আমায় সাহায্য করবে? ওকে আমি অনেকক্ষণ ধরে খুঁজছি কিন্তু খুঁজে পাচ্ছি না।
ও এই ব্যাপার, ভাবলাম কি না কি! ঠিক আছে, চল।
দু'জনে এক সাথে চলতে চলতে, জয়েস বলল-
তোমার পরিবারে কে কে আছে?
এই তো.... মা , বাবা আর আমি। (আর কি বলবে বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলো)
তুমি এত চুপ-চাপ থাকো কেন?
এমনি।
এমনি !
(এমন সময় জেসিকে দেখতে পেরেলো দু'জনেই, তাই সৃজু বলে...)
ঐ তো তেমার বান্ধুবী, তুমি ওর কাছে যাও আর আমি এখন যাই ।
বলেই হাটতে শুরু করে, পেছন থেকে জয়েস ডাকে কিন্তু সৃজু আর পেছন দিকে তাকায় না।
এই ভাবেই সৃজুর পার হয়ে যায় স্কুল জীবন, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন। যখন সে চাকরির জীবনে প্রবেশ করতে যাবে তখন আর চাকরি খুঁজে পাচ্ছিলো না । তার রেজাল্ট ভালোই তবুও কোন চাকরি হচ্ছে না।প্রতিদিন তার মা তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে যাতে ছেলের চাকরি হয়ে যায়। বাবা-মা দু'জনেই বৃদ্ধের খাতায় নাম লিখিয়েছে। মা এখন লাঠিতে ভর করে হাটে আর বাবা দু'বছর ধরে খুব কাশে এবং কাশের সাথে মাঝে মধ্যে রক্তও বের হয়। বাবার পেনশনের টাকা দিয়েই তাদের পরিবার বেশ মোটামুটি চলে যায়।
একদিন তার বাবা তার হাতে একটি কাগজ দিয়ে বলল, কাল সকাল-সকাল গিয়ে দেখা করতে ঐ অফিসে এবং সৃজু তাই করলো। খুব ভালো উচ্চমানের চাকরি পেয়েছে। প্রথম পর্যায়ে মাসে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা, সাথে ফেটে ফ্রি এর সাথে আরো আছে দুই মাসের বিশেষ প্রশিক্ষণ, দেশের বাইরে গিয়ে। চাকরিটা হওয়াতে সবাই খুব খুশি হলো। চাকরিতে যোগ দেবার সাথে সাথে এক মাসের মধ্যে দেশের বাইরে চলে গেল, প্রশিক্ষণের জন্য সৃজু। যখন সৃজু দেশের বাইরে চলে গেলো এর এক মাসের মাথায় ওর বাবা খুব অসুস্থ হয়ে পরে। এ খবর পেয়ে সৃজু দেশে ফিরে আসতে চাইলো কিন্তু ওর মা ওকে বাধা দেয়, বলে সেরে যাবে। কিন্তু এর এক সাপ্তাহ পর সৃজুর বাবা পরলোকগমন করে। সৃজু এসে বাবার মৃতের সমস্ত কাজ শেষ করে আবার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চলে যায়। সৃজুর যখন প্রশিক্ষণ শেষ হয়ে যায় সে দেশে ফিরে আসে এবং মাকে নিয়ে তার অফিস থেকে দেয়া ফ্ল্যাটে উঠে। এর এক বছর পর সৃজু বিয়ে করে। খুব ধুম-ধাম করে সৃজুর বিয়ে হয়।
বিয়ের পর প্রায় দু'বছর কেটে গেল। সৃজুও আস্তে আস্তে কেমন জানি পরিবর্তন হতে থাকে। শুধু বৌয়ের আঁচল ধরেই থাকে। বৌকে নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যায়, যখন যা মনে চায় এবং যা করতে বলে তাই করে। মার প্রতি কেমন জানি অবহেলা- অবহেলা ভাব চলে আসে। একদিন সৃজুর মা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে গিয়ে হোচট খেয়ে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়ে রক্ত পরতে থাকে। শব্দ পেয়ে সৃজু ও তার বৌ দু'জনেই দৌড়ে আসে। এসে সৃজু বলে-
কি হলো মা, তোমায় না বললাম তুমি নিচে নামলে আমায় ডাকবে। কি করবো তোমাকে নিয়ে যদি একটু কথা শুনতে।
না রে বাবা, আমি একটু.....
থাক থাক আর কিছু বলতে হবে না, তাড়াতাড়ি চল তোমার কপাল থেকে রক্ত রয়েছে। চল চল তারাতারি।
কিছু না বলে ছেলের সাথে ঘরে ফিরে আসে তার মা এবং মাকে সাথে সাথে নিয়ে গিয়ে ড্রেসিং করে দেয় যত্নের সাথে। রাতে সৃজুর বৌ সৃজুকে বলে-
দেখ মাকে এভাবে পাহারা দেওয়া যাবে না। মার এত বয়স হলো, সে যদি না বুঝে তাহলে আমরা কিঁ করতে পারি, আর যে আমাদের খরচ, তাতেএকজন কেয়ার টেকার যদি রাখি এতে আমাদের অতিরিক্ত খরচ হবে। তাই বলি কি মাকে যদি একটা বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসা যায়।
কি.....!
না তুমি একটু চিন্তা করে দেখ আমরা যখন বেবী নিব তখনও মা যদি এ রকম করে তখন আমাদের সন্তানের কি হবে, আমি কি সন্তান দেখবো না তোমার মাকে দেখবো?
শোন আজ আমি তোমাকে কিছু বিষয় তোমার সাথে সহভাগিতা করি-
আমি যখন খুব ছোট, মাত্র আমার জ্ঞান ধরেছে বা বলতে পারি কিছু কিছু বুঝি তখন আমার মা আমার খেলার সাথী ছিল। আমি খুব দুষ্টু ছিলাম, যখন যা আরজি করেছি তখনি তা পেয়েছি, আমার মা আমাকে কখনো কিছুতে কষ্ট পেতে দেয়নি, যত বড় ভুলই করিছি না কেন কখনও আমাকে গালি দেয়নি বা বকা-ঝকা বা মারেনি বরং এর বিনিময়ে আমাকে সব সময় আমার কাজের ব্যাখ্যা দিয়েছে, কোন কাজ করলে কি রকম হবে, কতটা ক্ষতি হবে, কার ক্ষতি হবে, এই সব কিছু আমাকে সেই ছোট থেকে শিক্ষিয়েছেন। আর বাবা তার কথা তো

না বললেই নয়, আমার ভালো বন্ধুদের মধ্যে একজন হলো বাবা। কখনোবা কাঁধে উঠে ঘুরেছি, কখনোবা ঘোড়া বানিয়ে বাবার পিঠে, কখনোবা চোর-পুলিশ বেশে। আজ তুমি আমাকে যে এই এত বড় একটি বেশে দেখতে পাচ্ছ এত বড় একটি কোম্পানির ম্যানেজার আমি, তা একমাএ আমার বাবা ও মার কারণে। আচ্ছা ধর তোমার একটি পুত্র সন্তান হলো, নিশ্চয়ই তুমি তাকে তোমার প্রাণের চাইতে বেশিভালোবাসবে, কি বাসবে না? (মাথা নেড়ে সৃজুর বৌ সম্মতি দেয়)। ধর তোমার ছেলের পেছনে তোমার অনেক ভালোবাসা এবং অনেক অবদান আছে। এক সময় সে বড় হলো এবং বিয়ে করলো, তখন তুমি বৃদ্ধ বুড়িমা । এখন ধর তোমর ছেলে যদি আজকের তোমার সিদ্ধান্তের মতো তোমাকে কোন এক বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে, তাহলে বল তখন তোমার কেমন লাগবে? আর যদি আমার সন্তান কোন দিন প্রশ্ন করে যে, বাবা আমার ঠাকু মা কোথায়? তখন আমি কি জবাব দেব, তুমি কি তা বলতে পার? হ্যাঁ আমি বিয়ের পর একটু অন্য রকম হয়ে গিয়েছি আর এত দিন লক্ষ্য করিনি, এটা আমারি ভুল। আরেকটি বড় সত্য যা আমি এত দিন জানতাম না, তা আমি গতকাল জানলাম। আসলে আমি যে অফিসে আজ ম্যানেজার আছি তা একমাত্র বাবা আর মার কারণে। বাবা আমার অফিসে কত বার যে গিয়েছিল তা আমি নিজেও জানতাম না, পরে প্রায় অনেক দিন পরে আমি জানলাম। এর থেকে বড় কথা হলো, আমার ঐ অফিসে চাকরি হবার জন্য প্রায় তিন লক্ষ টাকা লেগে ছিল।আর ঐ টাকা আমার বাবা-মা দিয়েছিল। কিন্তু ঐ টাকাটা ছিলো বাবার চিকিৎসার। বাবার ক্যান্সার হয়েছিল, আমাকে কখনো এ বিষয়ে বলেনি। ইচ্ছা করলেই পারতো সুস্থ হতে কিন্তু তা না করে আমার জন্য ব্যয় করলো। (সৃজু এবার কেঁদে দিল, কান্নাটি ছিলো অনেকটা বাচ্চাদের মত। কিছু সময় কাঁদার পর আবার বলতে শুধু করলো) আর এ বিষয়েটি আমি গতকাল মাএ জানলাম। মা আমাকে কখনো বলেনি এ বিষয়ে। তাহলে তুমিই বল আমি কি করে এ কাজ করতে পারি ? আর এই দেখ এতক্ষন যে আমি তোমার সাথে কোন রাগা-রাগি না করে তোমাকে এত কিছু বললাম তা আমার মার কাছ থেকে শিক্ষা পাওয়া। তাহলে...

সৃজুর বৌ সৃজুকে জড়িয়ে ধরে বলল-

আমায় তুমি ক্ষমা করো, আমি আর কখনো এসব কথা বলবো না এবং মাথায় আনবো না আর কালই মার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবো ও যতদিনই মা আছে তার একটি বাধ্য দাসির মতো আমি থাকবো। আমায় তুমি ক্ষমা কর। ক্ষমা কর.....

এবার সৃজুর বৌও কান্না শুরু করে দিল,

আরে পাগলী তুমি কান্না করছ কেন? যা হবার হয়ে গেছে এখন নতুন ভাবে গড়ে তুলো। মনে রাখবে তোমারও সন্তান হবে তুমিও কোন একদিন শাশুড়ি হবে এবং বৃদ্ধ হবে। তোমার সন্তানকে এমন শিক্ষা দাও যাতে সে কখনো ভুল পথ বেছে না নেয় এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সে যেন তোমার পাশে থাকে। সব মা-বাবারা তো তাই চায় যে তার সন্তানরা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যেন তার পাশে থাকে ॥

মিশে যাবো মাটিতে

মিল্টন রোজারিও

যতই গড়ো মাটির পুতুল
যতই করো তার পূঁজা,
মনে রেখো হে মানুষ তুমি
মাটিতে মিশে যেতে হবে সোজা।

যত বড়ই তুমি হও না কেন
যতই তুমি ঘর কর না কেন উপরে,
এক দিন ঠিক নেমে আসতে হবে
মাটির এই ছোট কবরে।

মানুষ যে আমরা সবাই সমান
এই পৃথিবীতে সৃষ্টিকর্তার কাছে,
ধন সম্পদ টাকা কড়ি বাড়ী
সবই পড়ে থাকবে মৃত্যুর পাছে।

এখনও মোদের সময় আছে
এসো গড়ে তুলি নিজেকে,
মনে রেখো হে মানব, একদিন
মিশে যেতে হবে এই মাটিতে।

বক্সনগর উপ-ধর্মপল্লীর প্রিয় প্রতিপালক মহান সাধু আন্তনীর পর্ব উদ্‌যাপন

বক্সনগর উপ-ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন । **আগামী ১৩ জুন, ২০২১** খ্রিস্টাব্দ, রবিবার বক্সনগর উপ-ধর্মপল্লীর প্রিয় প্রতিপালক **মহান সাধু আন্তনীর পর্ব পালন** করা হবে। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে প্রধান পৌরহিত্য করবেন মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই।

উল্লেখ্য, করোনায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত আকারে মহান সাধু আন্তনীর পর্ব পালন করা হবে। এতে বক্সনগরবাসী ছাড়া শুধু মাত্র অন্য ধর্মপল্লী থেকে যারা পর্বকর্তা হবেন এবং পর্বকর্তার সাথে ২জন পর্বীয় খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবেন। মহান সাধু আন্তনী আমাদের সবাইকে তাঁর আশীষ দানে ভূষিত করুন।

পর্বের শুভেচ্ছা দান ২০০০/- টাকা
খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য ১৫০/- টাকা

অনুষ্ঠানসূচী :

নভেনা খ্রিস্টযাগ : ০৪ জুন- ১২ জুন, বিকাল ৪:৩০ মিনিট
পর্বীয় খ্রিস্টযাগ : ১৩ জুন, রবিবার
প্রথম খ্রিস্টযাগ : সকাল ৭ টা
দ্বিতীয় খ্রিস্টযাগ : সকাল ৯:৩০ মিনিট

ধন্যবাদান্তে
ফাদার ষ্ট্যানলী কস্তা
পাল-পুরোহিত
ফাদার তুষার জেভিয়ার কস্তা
সহকারী পাল-পুরোহিত
সিস্টারগণ এবং ভক্তজনগণ

বিজ্ঞপ্তি / ১৫৩/২১

জীবনের গল্প - ১১

শরাব কাহিনী!

খোকন কোড়ায়া

ডিগ্রী পরীক্ষার রেজাল্ট বের হওয়ার পর পরই একটা চাকরি পেয়ে গেলাম। নতুন চাকরি, তারপরও একটু ছুটি পেলেই গ্রামে চলে যাই। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে বিকম পাশ মানে উচ্চ শিক্ষিত। ছেলে হিসেবেও খুব দুষ্ট ছিলাম না, তার উপর গান বাজনা জানতাম। হারমোনিয়াম বাজিয়ে নজরুলগীতি আর দেহতত্ত্ব গান গাইতাম, আবার খোলও বাজাতে পারতাম। তাই গ্রামের সবাই আমাকে ভালোবাসতো, আর গ্রহণযোগ্যতাও ছিলো সবার কাছে। তবে একটু বদ অভ্যাস যে ছিলো না তা বলা ঠিক হবে না। বন্ধুদের সঙ্গে থাকলে দু'একটা সিগারেট ফুকতাম। আর ধোয়ানীর রাত বা এই ধরণের কোন উপলক্ষে যখন গানের জলসা বসতো তখন জলসার অংশ হিসেবে দু'এক পাত্র বাংলা মদও গলাধকরণ করতাম, তবে মাত্রা রেখে।

তখন রোববার সাপ্তাহিক ছুটি। সোমবারেও একটা সরকারি ছুটি ছিলো তাই শনিবার লাস্ট লঞ্চে বাড়ি গেলাম, ফিরবো মঙ্গলবার ফার্স্ট লঞ্চে। রোববার গির্জায় দ্বিতীয় মিসার পর অনেক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। গল্প-আড্ডা শেষে একটু দেরি করেই বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। বর্ষা বিদায় নিচ্ছে, রাস্তার অনেক জায়গায় জল কাদা জমে আছে। তাই কিছুটা রাস্তা দিয়ে আবার কিছুটা বাড়ির উপর দিয়ে যেতে হচ্ছে। সাধনদার বাড়ির উঠোন দিয়ে যাচ্ছি, বারান্দা থেকে সাধনদা ডাকলো, খোকন বাবু না? (অনেকে আদর করে আমাকে খোকন বাবু ডাকতো) কবে আসলা ঢাকা থেকে? বললাম, কাল।

ভিতরে আস।

না দেরি হইয়া গেছে, বাড়ি যাই।

আরে বাড়ি তো যাইবাই, চা খাইয়া যাও একটু। আমার চরিত্রের সবচেয়ে দুর্বল দিক হল, কাউকে না বলতে পারি না। অগত্যা বারান্দায় উঠলাম। সাধনদা মধ্যপ্রাচ্যে চাকরি করে, ছুটিতে বাড়ি এসেছে। অনেক টাকা বেতন পায়। অনেক সুন্দর বাড়ি করেছে। তবে খুব দিলদরিয়া, দু'হাতে খরচ করে।

বারান্দায় আরো তিনজন বসা। একজন আমার সমবয়সী, তুহিন, অন্য দু'জন আমার চেয়ে ছয়/সাত বছরের বড়, সাধনদার বয়সী। কিছুক্ষণ পর বৌদি বান্দুরার রসগোল্লা, চাড়া বিস্কুট আর চা নিয়ে এলো। চা শেষ করে আমি দাঁড়িয়ে বললাম, যাই এখন। সাধনদা আমার হাত ধরে বসিয়ে বললো, আরে যাইবা কই, আসল জিনিস খাইয়া যাও।

আসল জিনিস মানে?

ঢাকা থিকা কেরণ কোম্পানীর এক বোতল ব্রান্ডি আনাইছি।

আমি খাইতে চাই না আজ, বাড়ি যাই।

এবার সবাই চেপে ধরলো, আরে এক পেগ খাইয়া যাও অন্তত।

আগেই বলেছি, আমি না বলতে পারি না।

গ্লাস খালি হলে আবার উঠে দাঁড়ালাম। এবার একজন বললো, আরে বস, মালইতো আছে অল্প। সবাই এক পেগ কইরা নিলেই শেষ, তারপর একসঙ্গেই যাই।

বোতল শেষ হওয়ার পর আরেকজন বললো, কিছু হইলোনারে সাধন।

সাধনদা তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে ঘরে গিয়ে এক বোতল বাংলা এনে টেবিলে রাখলো। এবার আমি উঠে দাঁড়ালাম। তুহিন বললো, আর পারবি না টানতে তাই না?

বললাম, ঠিক তা নয়, ইচ্ছে করলে আরো দু'তিন পেগ খেতে পারবো কিন্তু খাবো না।

তুহিন হেসে বললো, আসলে পারবি না তাই বল। আমি চিনিতো তোকে, তুই কমজোরী পোলা, দুই পেগের বেশী কোন দিনই খাইতে পারস না।

দু'পেগ ব্রান্ডি কাজ শুরু করেছে। ইগোতে লাগলো খুব। বললাম, ঠিক আছে খাবো, তুই যত পেগ খাস তত পেগই খাবো। আমাদের বিতণ্ডায় মজা নিলো সবাই ।

এতক্ষণ জয়পাড়ার ঝাল চানাচুর দিয়ে চলছিলো। বৌদি এবার পেঁয়াজ, মরিচ, তেল দিয়ে মাখানো এক বোল মুড়ি দিয়ে গেলো। এক বোতল বাংলা শেষ হলে, আরেক বোতল আসলো। সেটা শেষ করে সবাই উঠলাম। ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশীই পান করে ফেলেছি আমি।

সাধনদার উঠানেই প্রথম বমিটা করলাম। তারপর টলতে টলতে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। বেশীদূর যেতে পারলাম না, আবারও বমি হল। হাঁটার মত শক্তি আর অবশিষ্ট নেই। শুয়ে পড়লাম মাটিতে। মনে হল আমি শূন্যে ভেসে আছি আর পৃথিবীটা আমাকে নিয়ে চড়কির মত ঘুরছে।

কতক্ষণ এভাবে পড়ে ছিলাম জানি না। একসময় মনে হল কেউ আমার চোখে মুখে জল ছিটাচ্ছে। অনেক কষ্টে চোখ মেলে দেখলাম, অনেক মানুষ আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের পাশের বাড়ির দু'জন দাদা আমাকে উঠালো। তারপর দু'দিক থেকে দু'জন ধরে আমাকে বাড়ি নিয়ে গেলো।

বাড়িতে গিয়ে দেখি সেখানেও অনেক মানুষ। অর্থাৎ সবাই জেনে গেছে। মা আমাকে এই অবস্থায় দেখলে কতটা কষ্ট পাবে সেটা ভেবে নেশার ঘোরের মধ্যেও আমার চোখে জল এসে গেলো। আমার এক জেঠিমা আর জেঠতুতো বৌদি আমাকে ঘরে নিয়ে গেলো। মাকে দেখলাম আলতারের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। জেঠিমা মাকে উদ্দেশ্য করে বললো, খোকন আসছে, অর কাপড় বদলাইয়া অরে শুইয়ে দে। মা একচুলও নড়লো না আলতারের সামনে থেকে। শেষে জেঠিমা আর বৌদিই ভিজে গামছা দিয়ে আমার আমার মুখ হাত পা মুছে দিলো, আমি নিজে থেকেই লুঙ্গি গেঞ্জি পরে শুয়ে পড়লাম। সন্ধ্যা হয়ে আসছিলো, সবাই যার যার ঘরে চলে গেলো। মা আস্তে আস্তে এসে আমার পাশে বসে বললো, তরে এই অবস্থায় দেখুম, স্বপ্নেও ভাবি নাই বাবা।

সোমবার শুয়ে শুয়েই কাটলো। মার সেবা যত্নে আস্তে আস্তে দূর্বলতা কাটতে লাগলো। তবে মঙ্গলবার ঢাকায় ফেরা হল না। ঠিক করলাম, বুধবার যাবো। আমাদের পাশের বাড়ির শিলাবৌদির স্বামী অর্থাৎ শিশিরদা মধ্যপ্রাচ্যে চাকরি করে। শিলাবৌদি মাসে তিন চারটা চিঠি পাঠায় তার স্বামীকে। শিশিরদাও হয়তো সব চিঠির উত্তর পাঠায় বা হতে পারে আরো বেশী চিঠিই পাঠায়। সেই আমলে সেলফোনও ছিলো না, ইন্টারনেটও ছিলো না। বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিলো চিঠি। তাই শিলাবৌদিদের কাছে চিঠির গুরুত্ব ছিলো অনেক। প্রবাসী স্বামীর একটি চিঠি পাওয়া মানে স্বামীর অর্ধেক সান্নিধ্য পাওয়া। স্বামীদের কাছেও বিষয়টা ছিলো একই রকম। গ্রামের পোষ্ট অফিসে বা পিওনের হাতে চিঠি দিলে সে চিঠি বিদেশে পৌছতে অনেক সময় লাগে। তাই সবাই চায় কারো মাধ্যমে জিপিও বা ঢাকার কোন পোষ্ট অফিস থেকে চিঠি পোষ্ট করতে। আমি যতবারই বাড়ি আসি শিলাবৌদি প্রত্যেকবারই আমার হাতে চিঠি দিয়ে দেয় ঢাকায় গিয়ে পোষ্ট করার জন্য। এবারও আমি বাড়ি আসার পরই বলে গেছে আমি যেন যাওয়ার সময় অবশ্যই চিঠি নিয়ে যাই। মঙ্গলবার বিকেলে শিলাবৌদির বাড়ি গিয়ে বললাম, বৌদি, কাল ঢাকা যাচ্ছি, চিঠি দিবে বলেছিলে। শিলাবৌদি কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, চিঠিতো লেখা হয় নাই ভাই। পরের বার দিবো।

সঙ্গী-সাথী থাকলে লঞ্চে বেশ মজা করে ঢাকায় পৌঁছানো যায়। পেয়েও গেলাম একজনকে। আমাদের পাড়ারই ছোট ভাই, আমার চেয়ে দুই বছরের ছোট রাসেলকে। লঞ্চের আপার ক্লাসে বসে আরো দু'জনকে নিয়ে প্রায় দু'ঘন্টা তাস পিটালাম। তারপর রাসেলকে নিয়ে গেলাম লঞ্চের পিছন দিকে ছোট চায়ের দোকানে।

চা খেতে খেতে রাসেল বললো, দাদাতো রাজাবাজার যাইবা? বললাম, হ্যা, তুই?

আমি মনিপুরীপাড়ায়, দিদির বাসায়। একসঙ্গে যাইতে পারতাম কিন্তু আমার জিপিও হইয়া যাইতে হইবো। না হইলে কাইলকা আবার আসতে হইবো।

জিপিও ক্যান, চিঠি পোষ্ট করতে?

আরে কইও না, শিলা বৌদির চিঠি।

কিন্তু শিলা বৌদি যে আমাকে বললো, তার চিঠি লেখা হয় নাই।

দাদা তোমারে একটা কথা কই, কিছু মনে কইরো না। শিলাবৌদি যখন আমাদের বাড়ি আসলো চিঠি দিতে তাকে বললাম, বৌদি তুমি না সব সময় খোকনদার কাছে চিঠি দাও। বৌদি ঠোঁটটা বাঁকা করে বললো, আরে বাদ দে খোকনের কথা, মদ মাতাইলা মানুষ, চিঠি কোথায় ফালাইয়া দিবো, না কি করবো, তার ঠিক আছে!

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। একদিনের একটিমাত্র ঘটনায় আমি পরিণত হয়ে গেলাম একজন মদ্যপ, মাতালে; যার উপর ভরসা করা যায় না, নির্ভর করা যায় না। যাকে বিশ্বাসও করা যায় না!

(বি.দ্র. আমার নাম ছাড়া এই গল্পের কোন চরিত্রের নামই আসল নয়।)

হায়রে আম...

মানুয়েল চাম্বুগং

সকালের নাস্তা প্রস্তুত করার জন্য সেন্টি ও সেতুর মা খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে রান্না ঘরে যায়। সেন্টিও তার মায়ের সাথে সাথে ঘুম থেকে উঠে। জানালার দিকে তাকিয়ে দেখে বাইরে ঘন অন্ধকার। মনে মনে বলে বাইরে যে ঘুমোট অন্ধকার কিভাবে একা আম কুড়াতে যাই, এক কাজ করি ছোট ভাইকে সঙ্গে করে নিই। যেই ভাবনা সেই কাজ; সে তার আদরের ভাই সেতুকে ঘুম থেকে জাগায়। সেতু এই সেতু উঠ, চল আম কুড়াতে যাই। বিছানা থেকে উঠে, হাঁটু গেড়ে বসে দু'চোখে হাত বুলিয়ে সেতু বলল, আর কিছুক্ষণ পর যায় দিদি, একটু ঘুমিয়ে নেই। ঘুমা তুই, পরে গেলে একটা আমও পাবি না। মনে কিছুটা ভয় সংকোচ নিয়ে সেন্টি ঘর থেকে বের হয়। কিছুদূর গিয়ে কি জানি ভেবে আবার ঘরে ঢুকে। সেতু তখনও ঘুমাচ্ছিল। সেতুর গায়ে কয়েক ফোটা জল ছিটিয়ে তার হাতটেনে টুনে তাকে নিয়ে যায়। তাদের যাওয়ার পায়ের শব্দ শুনে মা জিজ্ঞেস করল, অন্ধকারে তোমরা কোথায় যাচ্ছ? মা আমরা আম কুড়াতে যাচ্ছি, সেন্টি বলল। রান্না ঘর থেকে বের হয়ে জোর গলায় মা বলল, সোনামুণিরা তোমরা এখন যেও না সকাল হলে যেও। ততক্ষণে তারা অনেকখানি পথ পাড়ি দিয়েছে। মায়ের গলার রব আবছা আবছা শুনে সেতু বলল, দিদি মা তো বলছে আমরা যেন আর একটু

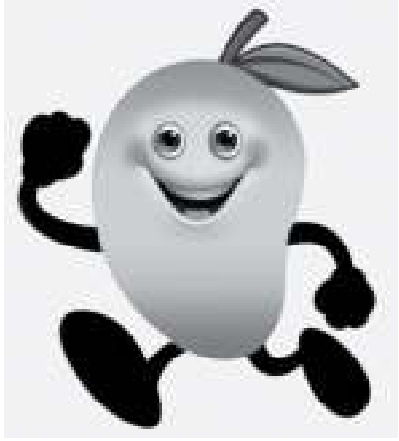

পরে যাই, তাছাড়া এই অন্ধকারে যেতে ভয় করছে যে। সেন্টি বলল, দুর কিছু হবে না চল্ চল্। সেন্টি সামনের দিকে দৌড়ায়। সেতু তাকে অনুসরণ করে। তখন বাইরে প্রচ্ছন্দ ঝড় সহ ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছিল। সেন্টি যেহেতু বড় তাই সে সেতুর আগে আগে দৌড়ায়। যেই মাত্র একটি আম গাছের নিচে পৌঁছলো, ঠিক ঐ মহুর্তেই মরা আম গাছের একটি বড় ডাল সেন্টির মাথায় পড়লো। সেই গাছের ডালের আঘাতে সেন্টি তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়ে যায়। এর কিছুক্ষণ পর সেতু সেখানে পৌঁচ্ছে। কিন্তু দেখতে সে পেল না তার দিদিকে। সেতু তার দিদিমণিকে ডাক দেয়, দিদি দিদি তুমি কই, এই দিকে আসো অনেক আম পড়ে আছে। কিন্তু তার দিদির কোথাও কোনো সাড়াশব্দ পেল না সে। তাই সে তার দিদি অন্যদিকে গেছে মনে করে আপন মনে আম কুড়ায়। হঠাৎ! ঐ সময় একটি ঝোপে কিছু একটা নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পায় সে। প্রথমে ভূত মনে করে সে ভয় পায়। কিন্তু পরক্ষণে ভাল করে গিয়ে দেখলো তার দিদি মাটিতে গড়াগড়ি করছে। কাছে গিয়ে সে দিদিকে ঠেলে। সেন্টির কোনো হুশ নাই দেখে সেতু কেঁদে কেঁদে তার মাকে ডেকে নিয়ে আসে। সেন্টিকে একটি ভ্যানে করে হাসপাতালে নিয়ে যায় তারা। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের অজপাড়া গাঁ থেকে হাসপাতালটি প্রায় ৫০-৬০ কিলোমিটার দূরে বিধায় হাসপাতালে নেওয়ার মাঝপথেই রক্তক্ষরণ হতে হতে সেন্টি না ফেরার দেশে চলে যায়।

প্রিয় বন্ধুরা, আমাদের মঙ্গলের জন্য পিতামাতা বা গুরুজন যখন তাদের অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদেরকে কোনো কিছু করতে বা কোনো কিছু করা থেকে বিরত থাকতে বলেন তখন আমরা কি বাধ্য ছেলেমেয়ের মতো তাদের কথা শুনে থাকি? এক্ষেত্রে জগতের বাস্তবতায় দুঃখের সাথে বলতে হয় আজকের ডিজিটাল যুগের ছেলেমেয়েরা বেশিরভাগই মা-বাবা ও বড়দের কথা শুনতে চাই না। সবকিছুতেই তারা নিজেদেরকে পারদর্শী মনে করে। স্বাধীন স্বেচ্ছাচার হয়ে পথ চলতে তারা বেশি স্বাচ্ছন্দবোধ করে। যার কারণে এই গল্পের সেন্টির মতো তারা তাদের বড়দের কথা অমান্য করায় সমাজে প্রায়ই দেখি বিভিন্ন ধরণের অনাকাঙ্ক্ষিত বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা। এই সমস্ত ছেলেমেয়েরা শুধুমাত্র তারা নিজেদের মূল্যবান জীবনকে ধ্বংসই করছে না এই সাথে তারা তাদের পরিবার, সমাজ ও দেশকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে। তাই প্রিয় বন্ধুরা আসুন আমরা আমাদের গুরুজন ও পিতামাতাদের ভালবাসার আদেশ মেনে চলে আশীর্বাদিত হই ॥

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

লেবাননের খ্রিস্টান নেতৃবর্গের সাথে পোপ ফ্রান্সিস দেখা করবেন

৩০ মে রবিবারের দুপুরের দূত সংবাদ প্রার্থনার পর পোপ মহোদয় লেবাবন ও এর জনগণের কথা স্মরণ করেন। ভাতিকানে সাধু পিতরের চত্বরের উপস্থিত জনতাকে তিনি বলেন, আগামী ১ জুলাই ভাতিকানে তিনি লেবাননের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রধান নেতৃবর্গের সাথে দেখা করবেন; লেবানন দেশটির উদ্বেগজনক পরিস্থিতি নিয়ে একদিন চিন্তা করবেন এবং দেশটির জন্য শান্তি ও স্থিতিশীলতার উপহারের জন্য একসাথে প্রার্থনা করবেন। লেবাননের হাসিশার তীর্থস্থানে বন্দিত ঈশ্বর জননী মা মারীয়ার মধ্যস্থতায় আস্থা রেখে আমি এই উদ্দেশ্য রাখছি এবং এই মুহূর্ত থেকে আমি আপনাদেরকে প্রার্থনার মধ্যদিয়ে প্রস্তুতির যাত্রার সাথে একাত্ম হতে আহ্বান করছি। যাতে করে এই প্রিয় দেশটি শান্ত-নির্মল ভবিষ্যত ফিরে পেতে পারে। গত সপ্তাহের শুরুতে ইউরোপীয় বিশপ সম্মিলনী ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাছে লেবাননকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট মোকাবেলা করতে সহায়তার দানের আবেদন করেছে। লেবাননের মণ্ডলী ভীত-শঙ্কিত হয়ে ইউরোপীয় বিশপ সম্মিলনীর কাছে চিঠির মাধ্যমে তাদের কথা তুলে ধরলে বিশপগণ ইউরোপীয় ইউনিয়নে সাহায্যের আবেদন করেন।

তিন সাহসী নারী

২৯ মে, শনিবার পোপ মহোদয় শুভেচ্ছা জানিয়ে স্পেনের আস্তোরগার মারীয়া পিলার গুলান, ইয়াতুরিয়াগা, অক্তাভিয়া ইগলেসিয়াস ব্লাঙ্কো এবং ওলগা পেরেজ-মন্তেসেরিন নুনেজের ধন্যশ্রেণীভুক্তকরণের কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন, এই তিনজন সাহসী নারী যুদ্ধে আহত ব্যক্তিদের ত্যাগ না করে তাদের সেবায় নিজেদেরকে বিলিয়ে দিয়েছেন, বিশেষ করে আহতদের তীব্র যন্ত্রণার সময় ঝুঁকি নিয়েও সেবা করেছেন। তাই দৃঢ় বিশ্বাসের কারণে তাদেরকে ঘৃণা করে হত্যা করা হয়। মঙ্গলসমাচারীর এই সাক্ষ্যদানের জন্য আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা করি। ধন্যশ্রেণীতে সদা ভুক্ত করা এই ৩জন ব্যক্তির জন্য এসো আমরা জোরে হাততালি দেই।

কোভিড-১৯ করোনাভাইরাসে ইণ্ডিয়াতে ৪০০জন পুরোহিত ও সন্ন্যাসব্রতী মারা গেছেন

কমপক্ষে ৪০০ জন পুরোহিত ও সন্ন্যাসব্রতী কোভিড-১৯ এর কারণে মারা গেছেন; যাদের মধ্যে অধিকাংশেরই মৃত্যু ঘটে এপ্রিল-মে মাসে কোভিডের ২য় ধারার সংক্রমণে। চার্চ পরিচালিত ইণ্ডিয়ান কারেন্টস্ ম্যাগাজিনের সম্পাদক কাপুচিন যাজক ফাদার সুরেশ ম্যাথিও জানান, করোনা মহামারিতে এপ্রিলের ২৯ তারিখ পর্যন্ত ইণ্ডিয়াতে ২০৩ জন পুরোহিত ও ২১০ জন সন্ন্যাসিনী এবং ৩জন বিশপ মারা যান। তাহলে মোট মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ২১৫জন। কোন কোন মৃত্যু হয়তো নথিভুক্ত হয়নি। তাই প্রকৃত সংখ্যা আরো বেশিও হতে পারে। ৩জন বিশপেরা হলেন: পণ্ডিচেরী-কুড্ডালর এর অবসরপ্রাপ্ত আর্চবিশপ আন্তুনী আনন্দদারায়ার এবং জাবুয়ার বিশপ বাসিল ভুরিয়া মারা গেছেন যথাক্রমে মে ৩ ও ৫ তারিখে। আর সিরো-মালাবার রীতির অবসরপ্রাপ্ত বিশপ যোসেফ আস্তর নেলানকায়িল মারা গেছেন ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ।

ফাদার ম্যাথিও বলেন, এই অধিক সংখ্যক পুরোহিত ও সিস্টারদের মৃত্যুর কারণ প্রত্যন্ত এলাকায় কাজ করা যেখানে চিকিৎসার সুযো-সুবিধা নেই। মণ্ডলী ও সমাজকে সেবা দিতে গিয়েই ফাদার-সিস্টারগণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিলেন। একইসাথে জাতীয়ভাবে স্বাস্থ্যখাতে অবকাঠামোর দুর্বলতা তো রয়েইছে। পুরোহিত ও সিস্টারগণ প্রত্যন্ত এলাকায় কাজ করেন এবং তাদের মাঝেই মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুও এই ধাক্কা লেগেছে ৯৮ ধর্মপ্রদেশে ও ১০৬ ধর্মসংঘে। সংক্রমণের ঝুঁকি সত্ত্বেও, ধর্মপ্রদেশ ও ধর্মসংঘগুলো সাধারণভাবেই মহামারির সময় যন্ত্রণাকাতর মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন। বেশকিছু ধর্মপ্রদেশ ও ধর্মসংঘ কোভিড-১৯ রোগিদের চিকিৎসার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছে। যেমন কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগিদের, তাদের পরিবারের সদস্যদেও বিনামূল্যে দান করা, ঔষধ দেয়া ইত্যাদি।

চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত ক্লেমেন্ট ডি'রোজারিও
জন্ম : ২৭ মার্চ, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৮ জুন, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : পুরান তুইতাল
ধর্মপল্লী : তুইতাল

"শান্তি, মহাশান্তি মাঝে তুমি আছ
সুন্দর ঐ রম্যদেশে তুমি আছ।"

দেখতে দেখতে চার বছর চলে গিয়ে ফিরে এলো **৮ জুন**। যেদিন তুমি আমাদের সবাইকে ফেলে রেখে চলে গেলে না ফেরার দেশে। তোমার অভাব কি করে পূরণ হবে মায়ের কাছে আর তোমার সন্তানদের কাছে। তুমি যে রয়েছ আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায়। মনে হয় তুমি সব সময় আমাদের আশে পাশে, আমাদের সঙ্গেই রয়েছ। মা প্রতিদিন খ্রিস্টযাগের পর তোমার কবরে যান। মা তোমাকে ছাড়া নয়, তোমাকে হৃদয়ের মাঝে নিয়ে বেঁচে আছেন। তোমার আদর, তোমার ভালবাসা ও শাসনে আমাদের ভাই-বোনকে মানুষ করেছো। আমাদের তুমি আশীর্বাদ করো যেন আমরা ভাই বোনেরা মাকে নিয়ে একসাথে ভালভাবে থাকতে পারি আর তোমার ইচ্ছা পূরণ করতে পারি। আমাদের বাবা ছিলেন পরোপকারি, সমাজ সেবক, সমবায়ী ও প্রার্থনাশীল মানুষ। মিশনের, সমাজের বিভিন্ন কাজে বাবা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন।

বাবা, আমরা বিশ্বাস করি তুমি স্বর্গীয় পিতার গৃহেই আছো। আমরা তোমার আত্মার কল্যাণে প্রার্থনা করছি। ঈশ্বর তোমার আত্মার চির শান্তি দান করুন।

তোমারই ভালবাসার
স্ত্রী : এনেষ্টিন ঊষা রোজারিও
বড়-ছেলে-বৌমা : মার্ক ও শিখা, নাতনী : নন্দিনী
মেয়ে ও জামাতা : রোজ ও পরিমল, নাতী-নাতী বৌ : আকাশ-চন্দ্রিকা, প্রিন্স
ছোট-ছেলে ও বৌমা : ভিক্টর ও ইভা
নাতী : রাজ, যশোয়া, নেইথ্যান

বিজ্ঞ/১৫৪/২১

পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘে আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ

সিস্টার গিদ্দিং সিমসাং সিএসসি ও সিস্টার উর্মিতা সিসিলিয়া রোজারিও সিএসসি : গত ১৪ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, সিস্টার তেরেজা (লাক্সমী) রিবেরু সিএসসি, মণ্ডলীতে ও পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘে আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। সিস্টার তেরেজা ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর জয়রামবের গ্রামের প্রশান্ত রিবেরু ও রত্না রিবেরু এর বড় মেয়ে। তিনি ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘে যোগদান করেন।

পবিত্র জপমালা রাণীর গির্জা, তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে সিস্টার তেরেজার আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ অনুষ্ঠানের পবিত্র খ্রিস্টযাগে আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই, পৌরহিত্য করেন। পবিত্র মঙ্গলবাণীর আলোকে আর্চবিশপ তার উপদেশে যিশুর সাথে সংযুক্ত থেকে ফলশালী হওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সিস্টার ভায়োলেট রড্রিকস্ সিএসসি পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘের এশিয়ার এলাকা সমন্বয়কারী সিস্টার তেরেজা (লাক্সমী) রিবেরু সিএসসি এর ব্রতবাণী এবং সংঘে আজীবন সদস্য রূপে গ্রহণ করেন। সিস্টার পুষ্প তেরেজা গমেজ সিএসসি, পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘের সাধারণ নেতৃ দলের প্রথম মন্ত্রণাদাত্রী, খ্রিস্টযাগ শেষে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এবং সিস্টার ভায়োলেট রড্রিকস্ সিএসসি, উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

করোনাভাইরাস মহামারির কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে, সীমিত আকারে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধর্মপ্রদেশীয় ও বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে আগত ছয়জন ফাদার, একজন ব্রাদার, সিস্টারগণ ও আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারী সিস্টারের পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণ। খ্রিস্টযাগ শেষে কীর্তনের মাধ্যমে নেচে গেয়ে আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারী সিস্টার তেরেজাকে গির্জা থেকে বরণ করে নেয়া হয় হলি ক্রস কনভেন্ট প্রাঙ্গণে। এখানে অতিথিবৃন্দ প্রীতিভোজে মিলিত হন। বিকেলে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারী সিস্টারকে সংঘের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়। পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘ সিস্টারের আজীবনের জন্য সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ ও আত্মদানের জন্য মহান ঈশ্বর ও সিস্টারের প্রতি কৃতজ্ঞ। সিস্টার তেরেজা (লাক্সমী) রিবেরু সিএসসি সবার প্রতি কৃতজ্ঞ ও আশীর্বাদ প্রার্থী।

তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত হলো হস্তার্পণ সংস্কার অনুষ্ঠান

লাকী ফ্লোরেন্স কোড়াইয়া : গত ১২ মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ বুধবার তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে হস্তার্পণ সংস্কার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। করোনা মহামারি আতঙ্ক থাকা সত্ত্বেও আমাদের ছেলেমেয়েদের জীবনে হস্তার্পণ সংস্কারের গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব মেনে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে হস্তার্পণ সংস্কার অনুষ্ঠিত হয়। এদিন মোট ১৬৯ জন ছেলেমেয়ে এই সংস্কার গ্রহণ করেন। পাল-পুরোহিত ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরে পূর্ব হতেই ঘোষণা দেন যেন সকলেই মাস্ক পরিধান করে ও সামাজিক দূরত্ব মেনে এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। শুক্রবার সকাল ৯টায় হস্তার্পণ সংস্কারের পবিত্র খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও। এই খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিলেন বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ, তেজগাঁও ধর্মপল্লীর যাজকসহ কয়েকজন যাজক। কার্ডিনাল তার উপদেশ সহভাগিতায় ছেলেমেয়েদের উদ্দেশে বলেন, হস্তার্পণ সংস্কারের মাধ্যমে আমরা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করি আর শক্তিশালী হই। আমরা দীক্ষিত ও প্রেরিত হই। পবিত্র আত্মা হলেন ঈশ্বরের মহাদান। একই সাথে তিনি হস্তার্পণ সংস্কার এর গভীর তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং ছেলেমেয়েদের সুন্দর জীবন গঠনের আহ্বান জানান। হস্তর্পণ সংস্কার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্রাদার, সিস্টার ও প্রার্থীদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন। সকলের আন্তরিক সাহায্য-সহযোগিতায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে ও ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্যের সাথে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠান শেষে পাল-পুরোহিত ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ সকল ফাদার, শিশু এনিমেটর, দিদিমনি, গানের দল ও, শিশুদের পিতামাতা ও অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারী সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

নারিন্দা পবিত্র ক্রুশ প্রার্থীগৃহের বার্ষিক নির্জন ধ্যান ও শিক্ষাসফর-২০২১

জয় আন্তনী রোজারিও : গত ৬ থেকে ১১ মে,২০২১ খ্রিস্টাব্দ, বিড়ইডাকুনি হোস্টেল, ময়মনসিংহে ৩৯জন পবিত্র ক্রুশ ব্রাদার প্রার্থী ও প্রার্থীগৃহে যোগদানে আগ্রহী ৩জন হোস্টেলের ভাইদের নিয়ে প্রার্থীগৃহের পরিচালকদ্বয় বার্ষিক নির্জনধ্যানের আয়োজন করেন । নির্জনধ্যানের মূল উদ্দেশ্য ছিল: প্রার্থীদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন ও করোনা মহামারিতে ঘরবন্দির একঘেয়েমিভাব কাটিয়ে উঠা । ৬ মে সন্ধ্যায় পবিত্রঘন্টা প্রার্থনা অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে নির্জনধ্যান শুরু হয়। উক্ত নির্জনধ্যানের মূলসুর রাখা হয়: Joy in Jesus, : he Healer of

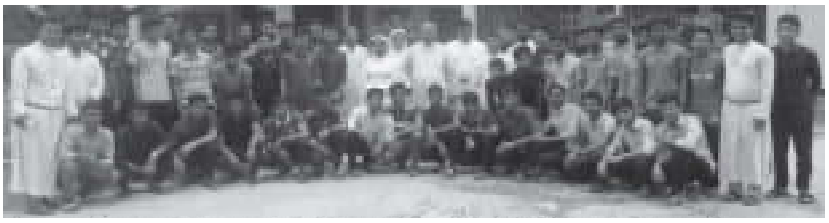

Broken Heart নির্জনধ্যানটি পরিচালনা করেন ফাদার আশিষ রোজারিও সিএসসি। তিনি প্রার্থীদের বিশেষভাবে সংঘবদ্ধ প্রার্থনার প্রতি জোরদার হতে আহ্বান করেন এবং দৈনন্দিন জীবনে এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। এছাড়াও সাক্রামেন্তীয় জীবন, ব্রতীয়জীবনের ব্রতসমূহ ও পবিত্র ক্রুশ সংঘের সংবিধান বিষয়ে সহভাগিতা করেন। প্রার্থীদের মতে, বিড়ইডাকুনি গির্জা চত্বরের শান্তশিষ্ট পরিবেশ নীরবে নিভৃতে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে কাটানোর জন্য খুবই উপযোগী ছিল। অবশেষে, ১১ মে দুপুরে পবিত্র খ্রিস্টযাগ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে বার্ষিক নির্জনধ্যান সমাপ্ত করা হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিড়ইডাকুনি ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার মনীন্দ্র চিরান। পবিত্র খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিলেন বিড়ইডাকুনি ধর্মপল্লী প্রাঙ্গনের সকল ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারগণ। এরপর ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে পবিত্র ক্রুশ প্রার্থীগৃহের পক্ষ থেকে সহকারী পরিচালক ব্রাদার রছি জাস্টিন কস্তা সিএসসি নির্জনধ্যান করার সুন্দর সুযোগ প্রদান করার জন্য বিড়ইডাকুনি ধর্মপল্লী প্রাঙ্গনের সকল ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

নির্জনধ্যানের পাশাপাশি প্রার্থীদের জন্য ক্ষুদ্র পরিসরে শিক্ষাসফরেরও আয়োজন করা হয়। তারা বার্ষিক নির্জনধ্যান শেষ করার পর ১১ ও ১২ মে বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করে। স্থানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গাজিরভিটা ও রাণীখং ধর্মপল্লী, বিজয়পুর চীনামাটির পাহাড়, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত (জিরো পয়েন্ট)। সমস্তকিছু সমাপ্ত হওয়ার পর ১২ মে রাত্রেই তারা পবিত্র ক্রুশ প্রার্থীগৃহের উদ্দেশে যাত্রা করে।

জাফলং ধর্মপল্লীতে মা দিবস উদ্‌যাপন

আলিসা খংলা : গত ৯ মে, রবিবার, সাধু প্যাট্রিকের গির্জা, জাফলং এ মা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এতে ৪২ জন অংশগ্রহণ করে। খ্রিস্টাগের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ শুরু হয় সকাল ১০:৩০মিনিটে। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন জাফলং ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা। খ্রিস্টযাগে সকল মায়েদের মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করা হয়। খ্রিস্টযাগের উপদেশে ফাদার তার উপদেশে বলেন, আমাদের জীবনে মায়ের ভূমিকা অনেক। মায়ের গর্ভে আমরা আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠি। মা আমাদের যত্ন করে মানুষ করে তুলেন। খ্রিস্টযাগের পর সকল মায়েদের ফাদার ফুলের মধ্যদিয়ে শুভেচ্ছা জানান। জ্যোৎস্না খংলা মায়েদের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানান। সেই সাথে সন্তানদের আদর্শবান সন্তান হিসেবে গড়ে তুলতে সবাইকে আহ্বান করেন। ইসাবেলা লামিন খাসিয়া ভাষায় মায়েদের কেমন মা হওয়া দরকার তা সহভাগিতা করেন। তাদের সহভাগিতা থেকে সবাই সচেতন ও অনুপ্রাণিত হয়েছে মায়ের গুণাবলীগুলো অর্জন করতে। সেই সাথে আদর্শ মা হিসেবে সন্তানদের গঠন দিতে। সবাইকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে জাফলং ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত দুপুর ১২টায় মা দিবস সমাপ্ত করেন।

তুইতাল ধর্মপল্লীর প্রতিপালক পবিত্র আত্মার পর্ব উদ্‌যাপন

অমিত গমেজ : গত ২৩ মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দে পঞ্চাশত্তমী রবিবারে মহা সমারোহে তুইতাল ধর্মপল্লীর প্রতিপালক পবিত্র আত্মার পর্ব পালন করা হয়। সকাল ৬টায় ও সকাল ৯টায় দুটি পর্বীয় খ্রিস্টযাগই উৎসর্গ করেন গোল্লা ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার স্ট্যানলী কস্তা। পর্বের পূর্বে ৯ দিন নভেনার মধ্যদিয়ে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির পর ধর্মপল্লীর প্রতিপালকের পর্বীয় উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। প্রতিটি নভেনায় মূলসুর হিসেবে ছিল পবিত্র আত্মার বিভিন্ন ফল; ভ্রাতৃপ্রেম, আনন্দ, শান্তি, মঙ্গলানুভবতা, সহৃদয়তা, সহিষ্ণুতা, বিশ্বস্ততা, সংযম, এবং ধৈর্য এর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধর্মপল্লী হতে আগত ফাদারগণ তাদের প্রাণবন্ত ও অর্থপূর্ণ সহভাগিতা রাখেন। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে ফাদার স্ট্যানলী কস্তা উপদেশ বাণীতে বলেন, "আমাদের দুইবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। প্রথম মায়ের গর্ভ থেকে এবং এরপর জল ও পবিত্র আত্মায়। আমরা প্রতিদিনই পবিত্র আত্মায় নবজন্ম লাভ করি এবং নতুন মানুষ হয়ে উঠি"। এছাড়াও তিনি আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মার ভূমিকা তুলে ধরেন।

পর্বীয় খ্রিস্টযাগে অন্যান্য ফাদারদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফাদার স্ট্যানিসলাউস গমেজ, ফাদার আলবিন গমেজ, ফাদার হিউবার্ট গমেজ ও ফাদার সনি মার্টিন রড্রিকস। এছাড়াও ব্রাদারগণ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিস্টারগণও পর্বীয় খ্রিস্টযাগে যোগদান করেন। অন্যান্য ধর্মপল্লী থেকে অল্প সংখ্যক খ্রিস্টভক্ত যোগদান করেন। করোনা ভাইরাসের মধ্যেও খ্রিস্টভক্তগণ আনন্দ ঘন পবিবেশে পর্ব উদ্‌যাপন করে। পর্বীয় খ্রিস্টযাগের সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ, সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতা জন্য ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার পংকজ প্লাসিড রড্রিকস্ প্রত্যেকের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সোনাবাজু উপ-ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকা ফাতেমা রাণীর পর্ব উদ্‌যাপন

অমিত গমেজ: গত ১৩ মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার সকাল ৯:৩০ মিনিটে মহাসমারোহে সোনাবাজু উপ-ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকা ফাতেমা রাণীর পর্ব পালন করা হয়। পর্বের পূর্বে নয়দিন নভেনার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয় এবং প্রতিটি নভেনায় ভিন্ন ভিন্ন মূলসুরের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধর্মপল্লী হতে আগত ফাদারগণ সহভাগিতা রাখেন। পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন সিলেট ধর্মপ্রদেশের নব নিযুক্ত ধর্মপাল বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। বিশপ মহোদয় তার উপদেশ বাণীতে বলেন, ফাতেমায় মা মারীয়া দর্শন দিয়ে জগতে শান্তির জন্য প্রার্থনা করতে অনুরোধ করেছিলেন। বর্তমান বিশ্বে শান্তির জন্য আমাদের আরো বেশি করে প্রার্থনা করতে হবে। আমরা যেন পরিবারে প্রতিদিন রোজারি মালা প্রার্থনা করি এবং সন্তানদের খ্রিস্টীয় শিক্ষা ও মূল্যবোধে গড়ে তুলি।

পর্বীয় খ্রিস্টযাগে যোগদান করেন বিশপসহ, ৭জন যাজক, ব্রাদারগণ ও তুইতাল ধর্মপল্লীর সিস্টারগণ উপস্থিত ছিলেন। পর্বীয় খ্রিস্টযাগের পর তুইতাল ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার পংকজ প্লাসিড রড্রিকস্ করোনাভাইরাসের মধ্যেও পর্ব পালন করতে পারায় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান। এছাড়াও বিশপ, ফাদার-সিস্টার এবং খ্রিস্টভক্তদের প্রতি ধন্যাবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন পর্বীয় খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করার জন্য।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস বাংলাদেশ একটি জাতীয় পর্যায়ের স্থানীয় অলাভজনক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, যা সমাজ কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে। এই প্রতিষ্ঠানের ঢাকা অঞ্চলের আওতাধীন "Medical Centres for the Marginalized and Poorest of the Poor (MCMPP) Project"- হেলথ প্রজেক্ট, এবং Ankur (অঙ্কুর) প্রকল্পের জন্য জরুরী ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পদে নিয়োগ ও প্যানেল তৈরীর জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। প্রার্থীর যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও শর্তাবলী সমূহ নিম্নরূপ।

পদের বিবরণ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা	অন্যান্য যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি
১. ট্রান্সলেটর (অনুবাদক)- কারিতাস এমসিএমপিপি প্রজেক্ট, জামগড়া, আশুলিয়া, সাভার **পদ সংখ্যা :** ১টি **বয়স :** ২৫-৩৫ বছর (৩০/০৫/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী)। **বেতন :** সর্বসাকুল্যে মাসিক ২৪,০০০/-(চব্বিশ হাজার) টাকা। ষান্মাসিক ভিত্তিতে বৎসরে দু'টি বোনাস প্রদান করা হবে, যা হবে এক মাসের বেতনের সমপরিমান টাকা। **নিয়োগের ধরণ :** চুক্তিভিত্তিক।	• স্নাতক/প্যারামেডিক কোর্স সম্পন্নকারী । • ইংরেজীতে কথোপকথনে পারদর্শী হতে হবে। চিকিৎসক এবং রোগীদের মধ্যে যোগাযোগে সহায়তাকারী হিসাবে অনুবাদকের দায়িত্ব পালন করতে হবে। • উপকারভোগীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা, দলীয় সভায় স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগে দক্ষ হতে হবে। • সংশ্লিষ্ট কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। • প্রার্থীর দলগতভাবে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। শেখার ও জানার আগ্রহ/ মানসিকতা থাকতে হবে। • সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি অগ্রাধিকার পাবে। • কাজের প্রয়োজনে অফিস সময় শেষ হবার পরেও কাজ করার ইচ্ছা ও মানসিকতা থাকতে হবে।
২. ক্লিনার - কারিতাস এসসিএমপিপি প্রজেক্ট, জামগড়া, আশুলিয়া, সাভার **পদ সংখ্যা :** ১টি **বয়স :** ২৫-৩৫ বছর (৩০/০৫/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী)। **বেতন :** সর্বসাকুল্যে মাসিক ৬,৫০০/- (ছয় হাজার পাঁচশত) টাকা। ষান্মাসিক ভিত্তিতে বছরে দু'টি বোনাস প্রদান করা হবে, যা হবে এক মাসের বেতনের সমপরিমান টাকা। **নিয়োগের ধরণ :** চুক্তিভিত্তিক।	• নূন্যতম ৮ম শ্রেণী পাশকৃত । • অফিস পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে । • কাজের প্রয়োজনে অফিস সময় শেষ হবার পরেও কাজ করার ইচ্ছা ও মানসিকতা থাকতে হবে। • শেখার ও জানার আগ্রহ/মানসিকতা থাকতে হবে • অফিস পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।
৩. কেয়ারটেকার কাম কুক - অঙ্কুর প্রজেক্ট, জামগড়া, আশুলিয়া, সাভার **পদ সংখ্যা :** ১টি **বয়স :** ২৫-৩৫ বছর (৩০/০৫/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী)। **বেতন :** সর্বসাকুল্যে মাসিক ৭,৫০০/- (সাত হাজার পাঁচশত) টাকা। ষান্মাসিক ভিত্তিতে বছরে দু'টি বোনাস প্রদান করা হবে, যা হবে এক মাসের বেতনের সমপরিমান টাকা। **নিয়োগের ধরন :** চুক্তিভিত্তিক।	• নূন্যতম ৮ম শ্রেণী । • রান্নার কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে । • অফিস রক্ষনাবেক্ষণের কাজে পারদর্শী হতে হবে। • বাস্তবে রান্নার কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।

আবেদনের শর্তাবলী :

১. আঞ্চলিক পরিচালক বরাবর আবেদনের জন্য আবেদন পত্রে যেসকল বিষয়গুলো উল্লেখ থাকতে হবে : **ক)** প্রার্থীর নাম **খ)** পিতার নাম /স্বামীর নাম **গ)** মাতার নাম **ঘ)** জন্ম তারিখ **ঙ)** বর্তমান ঠিকানা/যোগাযোগের ঠিকানা **চ)** স্থায়ী ঠিকানা **ছ)** মোবাইল নম্বর **জ)** শিক্ষাগত যোগ্যতা **ঝ)** ধর্ম **ঞ)** জাতীয়তা **ট)** বৈবাহিক অবস্থা **ঠ)** চাকুরীর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বর্তমান ও পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠানের কর্মরত তত্ত্বাবধায়ক/ব্যবস্থাপকের নাম, ঠিকানা, পদবী ও মোবাইল নম্বর আবেদনে উল্লেখ করতে হবে। চাকুরীর অভিজ্ঞতা নেই এমন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে দুইজন রেফারেন্স এর নাম, ঠিকানা, মোবাইল ফোন নম্বর ও আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক উল্লেখ করতে হবে। **২.** আবেদন-পত্রের সাথে অবশ্যই শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদপত্রের অনুলিপি, জাতীয় পরিচয় পত্র (NID), চারিত্রিক সনদ পত্র ও সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি জমা দিতে হবে। **৩.** কারিতাসে চাকুরীরত প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদন করার দরকার নাই। **৪.** ধুমপান ও নেশা দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নাই। ব্যক্তিগত যোগাযোগকারী বা কারোর মাধ্যমে সুপারিশকৃত প্রার্থীগণ অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। **৫.** প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র যোগ্য প্রার্থীদের বর্তমান ঠিকানায় লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হবে। আবেদনপত্র আগামী **১০/০৬/২০২১** খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ডাকযোগে/ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পৌছাতে হবে। সরাসরি কোন আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না। পদের নাম খামের উপর স্পষ্ট করে লিখতে হবে। **৬.** ত্রুটিপূর্ণ/ অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেখে পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন। **৭.** নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি **www.caritasbd.org** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

কারিতাস বাংলাদেশ সকল ব্যক্তির মর্যাদা এবং অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিশেষভাবে, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠির মর্যদা ও অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদানে সর্বদা দায়বদ্ধ থাকতে সচেষ্ট। কারিতাস বাংলাদেশের বিভিন্ন কার্যক্রমে সকল প্রকল্প অংশগ্রহণকারী, শিশু , যুবা ও প্রাপ্ত বয়স্ক, বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের সুরক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েই বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর। কারিতাস বাংলাদেশের কোন কর্মী, প্রতিনিধি, অংশীদারীদের দ্বারা শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের যেকোন ধরণের ক্ষতি, যৌন নির্যাতন, যৌন হয়রানি, যৌন নিপীড়ন ও শোষণমূলক কর্মকান্ড সংঘঠিত হলে তা কারিতাস বাংলাদেশের শূণ্য সহ্য নীতিমালায় (Zero Tolerance) বর্ণিত শাস্তির আওতাভূক্ত হবে।

আবেদনের ঠিকানা

আঞ্চলিক পরিচালক

কারিতাস ঢাকা অঞ্চল

১/সি, ১/ডি, পল্লবী, সেকশন-১২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

Caritas Bangladesh is an Equal opportunity employer

বিজ্ঞ / ১৫১/২১

"মরণ সে তো শেষ নয়,
ভক্ত প্রাণের নেইতো ক্ষয়।"

প্রয়াত ট্রিজা এনা গমেজ

জন্ম : ২৩ আগস্ট, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৩ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
নতুন ভাইঙ্গা বাড়ি, মহব্বতপুর
নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

সময়ের স্রোতে আরো একটি বছর পার হয়ে গেলো। তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছো দুইটি বছর হয়ে গেলো। তোমার শূন্যতা প্রতিক্ষণে আমাদের কষ্ট দেয়। তোমার ভালোবাসা, স্নেহ, শাসন প্রতি মুহূর্তে আমাদের মনে নাড়া দেয়। আমরা বিশ্বাস ও প্রার্থনা করি এই পৃথিবীতে তোমার ভালো কাজের জন্য তার পুণ্যগুনে পিতা পরমেশ্বর তোমাকে স্বর্গে স্থান দিয়েছে। তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো। তুমি প্রতিনিয়ত আমাদের মনে আছো । আমাদের প্রার্থনায় ও ভালোবাসায়।

নাতী,
জর্জ হেনরী গমেজ
টটেনহ্যাম, লন্ডন

১ম মৃত্যুবার্ষিকী

"নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই"

স্বর্গীয় সুরেন রিচার্ড কোড়াইয়া

জন্ম : ৯ এপ্রিল ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৮ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বাবা,
দেখতে দেখতে একটি বছর হয়ে গেল তুমি আমাদের ছেড়ে স্বর্গে পরম পিতার কাছে স্থান করে নিয়েছ। এত তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে চলে না গেলেই পারতে বাবা। তোমার অভাব প্রতিনিয়ত আমাদের কষ্ট দিয়ে যাচ্ছে। তোমাকে হারিয়ে আজ আমরা সকলে দিশেহারা হয়ে পড়েছি। যদি কোন কিছুর বিনিময়ে তোমাকে ফিরিয়ে আনা যেত তাহলে তাই করতাম। বাগানের সবচেয়ে সুন্দর ফুলকে নাকি ঈশ্বর সবার আগে তুলে নেয়, তুমিই তার প্রমাণ। মা এবং তোমার পরিবারের সকলে আজ তোমাকে হারিয়ে ভেঙ্গে পড়েছে।
বাবা, আজ তুমি বেঁচে থাকলে, কত সুখেই না পরিবারে আমাদের দিনগুলো কাটতো। তুমি স্বর্গ থেকে তোমার পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ করো যেন তোমার দেখানো পথেই আমরা জীবন-যাপন করতে পারি। আমাদের ছায়া হয়ে সবসময় পাশে থাক বাবা।

তোমাকে হারিয়ে শোকাহত,

স্ত্রী : শিল্পী কোড়াইয়া
বড়-মেয়ে ও মেয়ে-জামাই : মিথুন ও সেন্টি (নাতনি- মেঘান)
মেজো-মেয়ে ও মেয়ে-জামাই : মিথিলা ও ঊতি (নাতি- যোষান)
ছোট-মেয়ে : মিউনিয়া

দক্ষিন ভাদার্তী, তুমিলিয়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ২০
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 20
বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ২০
Regd. No. DA-33
❖ 6 - 12 June, 2021, ২৩ - ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

শ্রদ্ধাঞ্জলি

"মমতাময়ী মায়ের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি মাকে"

মাকে মনে
পরে আমার
মাকে মনে পরে

স্বর্গীয়া ভেরোনিকা প্রমিলা গোমেজ

জন্ম : ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৪ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : বালিডিওর, গোল্লা মিশন

শান্তি মহাশান্তির মাঝে তুমি আছো সুন্দর ঐ রম্যদেশে তুমি আছো

মাগো সময়ের পরিক্রমায় দেখতে-দেখতে তলিয়ে গেল অতল গভীরে দুঃসহ যন্ত্রণাঘেরা ১৪ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ। যেদিন তুমি আমাদেরকে ছেড়ে ঈশ্বরের ডাকে অমৃতধামে চিরদিনের জন্য আশ্রয় নিয়েছিলে। মা এখন শুধুই তোমার শূন্যতা অনুভব করি, যা পূর্ণ হবার নয়। তোমার স্নেহ, মায়া-মমতা ও ভালবাসা ছাড়া এক মুহূর্ত ভালো লাগে না, মনে হয় আমরা বড় অসহায়। মাগো আজও মনে হয় তুমি বাবা বলে ডাকছো, হারানো দিনের স্মৃতিগুলো মনে পড়লে চোখের জলে বুক ভেসে যায়, মাগো তুমি আছো আমাদের অন্তরে চিরকাল প্রদীপের আলো হয়ে জ্বলবে মনের গভীরে।

ব্যক্তিগত জীবনে মা মনি ছিলো সহজ সরল, কষ্ট-সহিষ্ণু, হিসাবী, ঈশ্বর নির্ভরশীল ও পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধ সম্পন্ন মানুষ। মা-মারীয়ার প্রতি অসীম ভক্তি ছিলো এবং নিয়মিত রোজারিমালা প্রার্থনা করতেন।

মায়ের মৃত্যুকালীন সময়ে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে বিশেষ করে ফাদার স্ট্যানলী, মাতব্বর, আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্য যারা নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা এবং প্রার্থনা করেছেন ও সান্ত্বনা দিয়েছেন তাদের সকলের প্রতি রইলো আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

মাগো স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো যেন তোমার শেখানো আদর্শ পথে চলতে পারি। তোমার জন্য আমরা সকলে প্রার্থনা করি, পিতা ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ ও অনন্তশান্তি দান করুন।

প্রিয় পাঠক, আমার মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী আগামী ১৪ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, সোমবার। অনুগ্রহপূর্বক সকলেই প্রার্থনায় স্মরণ করবেন। সকলকে ধন্যবাদ।

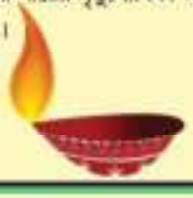

শোকাহত পরিবারের পক্ষে
তোমারই আদরের সন্তানেরা
তেজগাঁও ধর্মপল্লী

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro**, Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com**, Web: weekly.pratibeshi.org